মধুছন্দা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

শরৎচন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠিত
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

প্রকাশক
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
ব্লক সি, রুম ৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

পরিচালক
কিরীটিকুমার পাল

মুদ্রক
এন. সি. শীল
ইম্‌প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদচিত্র
শিল্পী অজিত গুপ্ত

পরিকল্পনা
শ্রীসত্যনারায়ণ দে

নিয়ন্ত্রণ
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৭১

কমলাকে (অঞ্জনা)

আশীর্বাদক

দাদা

মধুছন্দা

শ্লিপটার দিকে তাকিয়ে রইলো সুভাষ।

এ-এস-আই অর্থাৎ অশোক স্টিল ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডাই-রেক্টার সুভাষ ভৌমিক।

বেয়ারা এইমাত্র শ্লিপটা টেবিলের ওপরে রেখে গিয়েছে।

প্রথমটায় নজর পড়েনি—ফাইল দেখতে দেখতে ক্লান্ত সুভাষ সিগ্রেট কেসটা থেকে একটা সিগ্রেট নিয়ে ধরাতে গিয়ে নজর পড়ল তার শ্লিপটার ওপরে অকস্মাৎ যেন—

শ্লিপটায় লেখা : আপনি আমায় চিনবেন না, তাই নামটা আমার লিখলাম না। সামান্য সময়ের জন্য দেখা করবার অনুমতি দিলে খুশি হবো—

পরিষ্কার ছোট ছোট ইংরেজীতে কথাগুলো লেখা।

সত্যিই বিচিত্র।

কোনো দর্শনপ্রার্থী যে ওইভাবে ওই ভাষায় শ্লিপ পাঠাতে পারে, সুভাষ যেন এখনো ভাবতে পারছে না।

সবাই জানে ভৌমিক সাহেব অত্যন্ত কড়া প্রিন্সিপ্যালের লোক।

এগারো বছর ইংলণ্ডে কাটিয়ে এসেছেন—চলনে-বলনে-মেজাজে একেবারে সব কিছুতে যেন একজন পাকা সাহেব।

একবার ভাবল ভৌমিক সাহেব শ্লিপটা ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে—কিন্তু আ'বার কি ভেবে কাগজটা হাতে ধরেই কলিং বেলটা বাজাল।

বেয়ারা ঘরে এসে সেলাম দিল।

যো স্লিপ দিয়া উস্‌কো ভেজ দো—

বেয়ারা সাহেবের মুখের দিকে তাকাল—যেন একটু ইতস্তত করে, কি যেন বলতে চায়—

ভৌমিক সাহেব পুনরায় বলে, যাও—ভেজ দো—

ভৌমিক সাহেব কথাটা বলে আর বেয়ারার দিকে তাকাল না, ফাইলটা টেনে নিল।

একটু পরে এয়ার কণ্ডিসন ঘরের দরজাটা খোলার মৃদু শব্দ পাওয়া গেল—

ভৌমিক সাহেব বুঝতে পারে—কে যেন ঘরে ঢুকে পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভৌমিক সাহেব ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললে, বস্থন—বস্থন—

আগন্তুক কিন্তু বসল না।

দাঁড়িয়েই থাকে।

ভৌমিক সাহেব জানতে পারে ব্যাপারটা অনুমানেই।

ভৌমিক সাহেব এবার মুখ তুলল।

আগন্তুকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আগন্তুক হাত তুলে নমস্কার জানাল।

নমস্কার—

বস্থন—

আগন্তুক চেয়ারটার ওপর বসল ভৌমিক সাহেবের মুখোমুখি।

রোগা—অত্যন্ত রোগা লোকটা।

লম্বায় নিশ্চয়ই পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চির বেশি হবে না।

টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ।

এত শাদা যে, মনে হয় বুঝি একবিন্দু রক্ত নেই মানুষটার দেহে কোথায়ও।

টানা টানা দুটো চোখ, স্বপ্নালু ধারালো নাক আর চিবুক।

পরনে একটা পায়জামা ও খোলা হাতা গেরুয়া রংয়ের অতি সাধারণ পাঞ্জাবি।

ডান কাঁধের ওপর একটা ছিট কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

হঠাৎ মনে হয় ভৌমিক সাহেবের—লোকটা যেন তার চেনা-চেনা, কবে কোথায় যেন ভৌমিক সাহেব ওই লোকটাকে দেখেছে।

ঠিক অমনি চেহারার একটি রোগা ফর্সা মানুষকে কোথায় যেন দেখেছিল ভৌমিক সাহেব—

কবে, কতদিন আগে, কোথায়—সেটাই কেবল স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না কিছুতেই।

মনে করতে পারছে না ভৌমিক সাহেব।

আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?

ভৌমিক সাহেব প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—

কোনো চাকরির ব্যাপার কি?

আজ্ঞে না—

তবে?

আপনি নরেন্দ্রপুরে একটা বাড়ি করেছেন শুনলাম—

হ্যাঁ—কিন্তু—

শুনলাম আপনি সেই বাড়ির ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকাতে চান তাই একজন—

আপনি একজন আর্টিস্ট—

হ্যাঁ—

কি নাম আপনার?

সৌমিত্র সেন।

আপনার কোনো আঁকা ছবি আপনার সঙ্গে আছে কি—

মৃদু হেসে সৌমিত্র বলে, না—

আগে ওই ধরনের কাজ কোথাও করেছেন?

না—

I see—

ভৌমিক সাহেব একটু চিন্তিত—হাতের সিগারেটটা এ্যাস্‌ট্রেতে ঠুকতে থাকে মৃদু মৃদু।

আপনি আমাকে সামান্য কাজ দিয়ে দেখতে পারেন—যদি আপনার পছন্দ হয় কাজ দেবেন, নচেৎ—

সুভাষ যেন কি ভাবল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর বললে, বেশ, তাই হবে। আপনি আজ সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুরে আমার বাড়িতে আসবেন।

কখন—সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গেলে হবে?

হবে। আপনি বাড়িটা কোথায় জানেন তো?

জানি—

দেখেছেন নাকি?

দেখেছি।

বাড়িটা আমার দেখেছেন!

পুনরায় প্রশ্ন করে ভৌমিক সাহেব।

হ্যাঁ—

বাড়িটার ভেতরে Decoration-এর ব্যাপারে আমি সত্যিই ভাবছিলাম কিন্তু আপনি সেকথা জানলেন কি করে?

জানতে পেরেছি।

সৌমিত্র বলে।

মিঃ সেন, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি—খবরটা আপনি কার কাছে পেলেন।

আপনি ধর এণ্ড সন্সকে বলেছিলেন—

হ্যাঁ, কিছুদিন আগে একটা পার্টিতে মিঃ ধরের সঙ্গে কথা হয়েছিল বটে আমার—তাহলে মিঃ ধর আপনাকে চেনেন।

সামান্যই—বলবার মত এমন কিছু নয়।

ঠিক আছে। তা হলে আপনি আসবেন—

আমি তাহলে উঠি, নমস্কার—

নমস্কার।

লোকটা চলে যাবার পরও সুভাষ ভৌমিক অনেকক্ষণ ধরে ওর সম্পর্কে চিন্তা করে।

লোকটা এমন চেনা-চেনা লাগলো—অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না, কোথায় লোকটাকে সুভাষ দেখেছে।

আশ্চর্য !

এক এক সময় পরিচয়ের সূত্রগুলো এমন এলোমেলো হয়ে যায় যে কিছুতেই যেন তাকে ধরা যায় না, যাকগে—মরুকগে ছাই—

হয়তো সুভাষ ইতিপূর্বে লোকটাকে আদৌ দেখেনি—এমনিই মনে হচ্ছে কথাটা।

এমন তো কত কথা হয়ও।

সম্পূর্ণ অপরিচিতকেও হঠাৎ যেন চেনা-চেনা মনে হয়। এও হয়তো তেমনি কিছু।

পরের দিন—

সাতটা নাগাদ নয়, লোকটা এলো রাত প্রায় সোয়া আটটায়।

ভৌমিক সাহেব তখন বিস্তৃত লনের একপাশে চেয়ার পেতে বসেছে। সামনে পেগ গ্লাস—ও ভ্যাট ৬৯এর বোতল—

আর মুখোমুখি বসে স্ত্রী মীরা কিছু ব্যবধানে।

মীরার হাতে একটা উলের বুনুনী।

সে আপন মনে নিঃশব্দে বুনে চলেছে মুখটা নিচু করে।

প্রতিদিন সন্ধ্যারাত্রি থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঠিক এমনিই চলে।

ভৌমিক সাহেব লনে ওই চেয়ারটায় বসে একটু একটু করে ড্রিংক করে যায় আর সামনে বসে থাকে মীরা, তার স্ত্রী।

সে হয় বোনে অথবা কোনো একটি ইংরেজী নভেল নিয়ে পড়ে যায়।

কারো সঙ্গে কারো একটা বড় কথাই হয় না।

অথচ দুজনেই দুজনের কাছাকাছি বসে থাকে।

ঠিক রাত দশটায় আবদুল এসে জানায়, খানা তৈরি—ডাইনিং টেবিল কি রেডি করা হবে—

ভৌমিক সাহেব বলে, হ্যাঁ—দাও।

সন্ধ্যা থেকে রাত্রির ওই সময়টুকু ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে বড় একটা দেখাও হয় না।

ভোরবেলা ভৌমিক সাহেব যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে, মীরা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কারণ রাত দুটোর আগে কোনো রাত্রেই তার ঘুমই আসে না, আসতে চায় না।

এবং শেষ পর্যন্ত স্লিপিং পিলস খেলে তবে ঘুম।

শেষ রাতের দিকে তাই বোধহয় সেই ঘুমটা ভাঙতে চায় না।

এবং মীরা যখন ঘুম ভেঙে ওঠে, তার ঢের আগে স্নান করে ব্রেক-ফাস্ট সেরে ভৌমিক সাহেব অফিসে চলে গিয়েছে।

ফিরবে আবার সেই সন্ধ্যার ঠিক আগে।

দুজনে একঘরে শোয়ও না।

পাশাপাশি দুটো ঘরে দুজনের পৃথক পৃথক শোবার ব্যবস্থা।

মধ্যবর্তী অবিশ্যি একটা দরজা আছে এবং দরজাটা ভেজানোই থাকে।

ক্বচিৎ কখনো সেই ভেজানো দরজাটা গভীর রাত্রে খুলে যায়, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে একটা ঝাপসা ছায়া যেন এসে প্রবেশ করে।

প্রথম প্রথম হঠাৎ মীরা চমকে উঠতো, কিন্তু ক্রমশ ব্যাপারটা এমন অবশ্যম্ভাবী ও সহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, মীরা যেন সহজ স্বভাবেই নিজেকে সমর্পণ করে দিত—ঠিক যেমন করে কেউ অন্ধকারে

নিজেকে কোনো নিষ্ঠুর অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

সেইসব রাত্রে মীরার স্লিপিং পিলসেও ঘুম আসে না।

সমস্ত শরীরটা যেন কি এক ঘৃণায় ঘিন ঘিন করতে থাকে কেবলই।

উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢোকে—অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে শরীরটা যখন ঠাণ্ডা হয় তখন লনের মধ্যে গিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যার ওই সময়টা কারো সঙ্গেই ভৌমিক সাহেব কখনো দেখা করে না।

তাতেই বোধকরি মীবা একটু বিস্মিতই হয়।

বেয়ারা বনমালী বলে, আপনি নাকি তাকে এই সময় আসতে বলেছিলেন বাড়িতে, তাই এ..েছে—

প্রথমটায় ভৌমিক সাহেবের ভ্রূ তুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, শেষের কথায় বনমালী আবার সরল হয়ে এলো।

বললে, যা—এখানে নিয়ে আয়।

মীরা এবার 'আরো বিস্মিত হয়ে যেন স্বামার মুখের দিকে তাকা়।

বনমালী চলে...

ভৌমিক সাহে, আসতে আসতে গাড়িতে বসে সেই কথাটাই কেদারার ওপর দয়েছিল।

সামনের ...জিনে গিয়েছিল নৈনিতাল।

ম্যাগাজিন ছিল 'বারে লেকের গায়ে।

পাতা ওলটান্দা থেকে লেকটা চমৎকার দেখা যায়।

আড়চোখে তাকা:—

স্বামী-স্ত্রী এরা

কিন্তু সম্পর্ক গড়ে উঠলোই না বা কেন, যেমন আর দশটা সংসারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।

দোষ কার!

সুভাষের, না মীরার?

সুভাষ তো দেখেশুনেই জেনেশুনেই মীরাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

আর মীরা—

মীরাও তো বিয়ের আগে বেশ কিছুদিন দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছিল—

অশোক স্টিল ইণ্ডাস্ট্রিজে সে তখনো ঢোকেনি—বিলেত থেকে বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘ চার বছরের ওপর দেশে ফিরে এসেছে তখন।

অবশ্য মীরার বাবা অশোক মিত্র ও তার বাবা শিবেন ভৌমিকের সঙ্গে বহুদিনের আলাপ।

শিবেন ভৌমিক কলকাতা শহরের বিরাট একজন নামকরা ব্যারিস্টার—মাসে তখন বিশ হাজারের চাইতেও বেশি ইনকাম আর অশোক মিত্র স্টিল ম্যাগনেট বলে পরিচিত।

শিবেনের ওই একমাত্র ছেলে সুভাষ এবং অশোক মিত্রেরও ওই মাত্র সন্তান মীরা।

পাশাপাশি দুদের ঘরে দুজনের পৃথক দেবেন মধ্যানবটা নাকি ওদের মধ্যবর্তী অবিশ্যি একটা দরজা আছে এবং দরণেই ওরা তাদের থাকে। পরের সঙ্গে।

ক্বচিৎ কখনো সেই ভেজানো দরজাটা গভীর

এক ঘর থেকে অন্য ঘরে একটা ঝাপসা ছায়া যেন এসাহেব তার ছেলে

প্রথম প্রথম হঠাৎ মীরা চমকে উঠতো, কিন্তু পাঠিয়ে দিয়ে-

এমন অবশ্যম্ভাবী ও সহনীয় হয়ে উঠেছিল যে,

ভাবেই নিজেকে সমর্পণ করে দিত—ঠিক যেমন ব সাহেব হয়ে সুভাষ

যখন দেশে ফিরে এলো তখন সে জানতেও পারেনি—ও থেকে সরানোর জন্য পরিচয়ের স্মৃতিটুকু মীবার মন থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্ক. গিয়েছে এবং শুধু তাই নয়, মীরার মনের সবটা জুড়ে তখন . একজনের ছবি।

সে ছবির নানা রং—নানা রেখা।

সন্ধ্যার এক পার্টিতে দেখা হলো দুজনের—

মিস মিত্র, চিনতো পাবছো নিশ্চয়।

কেন চিনবো না!

না, ভাবছিলাম—

কি ভাবছিলেন ?

চাব বছর—a pretty long time—

তাই বুঝি!

নয় কি—

॥ ২ ॥

অফিসে হঠাৎ যাকে দেখে ভৌমিক সাহেবের কেমন চেনা-চেনা মনে হয়েছিল অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছিল না, লোকটাকে সে কবে কোথায় দেখেছে—

বাড়িতে ফিরে আসতে আসতে গাড়িতে বসে সেই কথাটাই চিন্তার মধ্যে ধরা দিয়েছিল।

বিয়ের পরে দুজনে গিয়েছিল নৈনিতাল।

হোটেলটা একেবারে লেকের গায়ে।

হোটেলের বারান্দা থেকে লেকটা চমৎকার দেখা যায়।

শরৎকাল সেটা—

নীল আকাশ।

কিন্তু সম্পর্ক...স্থভাষ নৈনিতালে হনিমুনের ক'টা দিন কাটাবে বলে সংসারের স্মারাকে নিয়ে গিয়েছিল।

সে পাহাড় লেক চিরদিন তার অত্যন্ত ভাল লাগে—

কাশ্মীরে যেতে পারত কিন্তু কাশ্মীরে যেন বড্ড ভিড়।

কিন্তু সুভাষ স্বপ্নেও ভাবেনি যে, তার মধুচন্দ্রিকার আনন্দঘন দিনগুলো বিষে একেবারে কালো হয়ে যাবে।

নৈনিতালে পৌছবার দিন চারেক বাদে—

শরতের আকাশটা সেদিন আলোয় ঝলমল করছে।

মীরাকে নিয়ে বোটিং করবে বলে ঘরে মীরাকে ডাকতে ঢুকেছে, কিন্তু মীরাকে দেখতে পেলে না—

অথচ মীরা তো ঘরেই ছিল।

কোথায় গেল মীরা—

মীরা বোধহয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাউকে চিঠি লিখছিল—

চিঠি লিখতে লিখতেই কখন এক সময় হয়তো সব বিছানার ওপরে ছড়িয়ে রেখেই বেরিয়ে পড়েছে।

রাইটিং প্যাড, কলম, ফোলিও সব ছত্রাকারে ছড়ানো।

অর্ধসমাপ্ত একটি চিঠি—

চিঠিটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠেছিল সুভাষ।

সৌমিত্র,

তুমি কোথায় কত দূরে আজ জানি না।

জানবার চেষ্টা করবারও আমার অধিকার নেই। আমি জানি তুমি বিশ্বাস করবে না কিন্তু তবু জানাই, এ চক্রান্তের মধ্যে আমার কোনো হাত ছিল না।

এবং হাত ছিল না বলেই সে রাত্রে অকস্মাৎ ব্যাপারটা জানতে পেরে ছুটে গিয়েছিলাম তোমার মেসে তোমাকে সাবধান করে দিতে।

বাবা যেন তোমার প্রতি নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

যে কোনো উপায়ে তোমাকে আমার পথ থেকে সরানোর জন্য একটা অন্ধ আক্রোশে তিনি যেন ক্ষেপে উঠেছেন।

ওই চিঠির নিচেই সৌমিত্রর ফটোটা দেখতে পেয়েছিল।

ফটোটা তুলে দেখছে হঠাৎ বাথরুমের দরজায় শব্দ—

মীরা বাথরুমে গিয়েছিল—

তাড়াতাড়ি সুভাষ ঘরের ভেতর থেকে পালিয়ে এসেছিল।

কিন্তু সেই ফটোর চেহারাটা তার মনের পাতা থেকে জীবনে আর মুছে যায়নি।

সেই ফটোর সঙ্গে হুবহু মিল সৌমিত্রর চেহারার—আর নামটাও সেই সৌমিত্র—

ভৌমিক সাহেব স্ত্রীর মুখের দিকে আবার তাকাল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, লোকটা সত্যিকারের একজন আর্টিস্ট—বেণু দত্তও প্রশংসা করছিল, তাই ভাবছি তাঁকে দিয়ে আমাদের এই বাড়িটা ডেকরেট করে নেবো—

মীরা কোনো জবাব দিল না—হাতের বুননের প্যাটার্নটা চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করতে লাগল।

মনে হলো স্বামীর কথাগুলো যেন তার কানেই যায়নি।

আগে ভাবছি তোমার শোবার ঘরটা ও করুক।

আমার ঘর—

এতক্ষণে মীরা চোখ তুলে তাকালো।

হ্যাঁ—

মীরা বললে, কেন পারলারটা প্রথমে করুক না—

মীরার কথার জবাবে আর কিছু বলা হলো না, কারণ ততক্ষণে বনমালীর সঙ্গে সঙ্গে সৌমিত্র সেন এসে হাজির হয়েছে।

সেই গেরুয়া রংয়ের ঢোলা পাঞ্জাবি ও ঢোলা পায়জামা, পায়ে চপ্পল—

মাথার চুল এলোমেলো রুক্ষ—কাঁধে সেই কাপড়ের ব্যাগ।

বসুন, বসুন মিঃ সেন—

মীরা তাকিয়েছিল আগন্তুকের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

সৌমিত্র সেনও চেয়ে থাকে মুহূর্তের জন্য বুঝি মীরার মুখের দিকে, তারপরই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে পড়ে ভৌমিক সাহেবের দিকে তাকায়।

মীরাও ততক্ষণে বুননের মধ্যে আবার মনঃসংযোগ করেছে।

মুহূর্তের ওই ব্যাপারটায় ভৌমিক সাহেবের নজর কিন্তু এড়ায় না।

সে ওই সময়টা গ্লাসটা ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে সিপ করছিল।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে এবারে একটা সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে ভৌমিক সাহেব আবার সৌমিত্র সেনের দিকে তাকায়।

কি যেন আপনার নামটা তখন বলছিলেন ?

সৌমিত্র সেন।

মৃদুকণ্ঠে সৌমিত্র জবাব দিল।

মীরা মুহূর্তের জন্য থেমে আবার বুনে চলে।

অগ্রহায়ণ প্রায় শেষ হয়ে এলো।

সন্ধ্যার পরেই বাইরে আজকাল একটু একটু ঠাণ্ডা মনে হয়।

শিশিরও পড়ে।

Let me introduce—মীরা আমার স্ত্রী—

সৌমিত্র সেন হাত তুলে নমস্কার জানাল, নমস্কার।

নমস্কার—

মীরাও প্রত্যুত্তর দেয়।

তারপরই মীরা উঠে দাঁড়ায় চেয়ারটা ছেড়ে।

তোমরা তাহলে কথা বলো—আমার একটু কাজ আছে।

মীরা আর দাঁড়াল না—লনের ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল ভেতরের দিকে।

মিঃ সেন—

বলুন—

ভাল কথা, আপনি কাল চলে যাবার পর বেণু আমাকে টেলিফোন করে সে তো আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল—অবিশ্যি তার আগেই আমি decide করেছিলাম—বাড়িটা আপনার হাতে আমি ছেড়ে দেবো—আপনার খুসি ও ইচ্ছামত ঘরের ও বারান্দায়, সিঁড়ির দেওয়ালে যেখানে যা আঁকবার দরকার—এঁকে দেবেন—

তারপরই একটু থেমে ভৌমিক সাহেব বলে, দেখুন মিঃ সেন, সমস্ত ব্যাপারই আমি গোড়াতেই স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলাটা ভালবাসি, তাই বলছিলাম আপনাকে—কি রকম পারিশ্রমিক দিতে হবে সেটা আমার জানা দরকার—

আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই দেবেন—

উহুঁ—দেখুন আমি একজন out and out business man—আপনার কথাটা ঠিক business like কথা হলো না—বলুন কি চান ?

আমি তো ঠিক এর আগে এ ধরনের কোনো কাজ করিনি—তাই কি বলবো—

বেশ—তবে বেণুকে বলবো ঠিক করে দিতে—সে যা বলবে তাই পাবেন, রাজী ?

বেশ তো, তাই দেবেন।

বেশ। আপনি এখানেই থাকবেন তো !

এখানে—

হ্যাঁ···আপনারা আর্টিস্ট মানুষ, আপনাদের মন-মেজাজ নিয়ে হচ্ছে কাজ—দৌড়াদৌড়ি করলে মন-মেজাজ ঠিক থাকবে কেন। তা ছাড়া আমার এখানে আপনার থাকবার কোনো অসুবিধাও হবে না—

তারপর একটু থেমে বলে, মীরা মানে আমার স্ত্রী—তার মনের মত করে বিরাট বাড়ি করেছে অথচ থাকবার মধ্যে আমরা দুজন আর ডজনখানেক চাকর-বাকর ইত্যাদি। বাইরের একটা ঘর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

কিন্তু—

সেই সবচাইতে ভাল হবে—কেউ আপনাকে কোনোরকম Interfere করবে না—আপনার খুসিমত যখন যেমন ইচ্ছা হবে কাজ করবেন—তাহলে ঐ ব্যবস্থাই হলো। এখন বলুন, when you are coming—কাল আসবেন—

তাই আসবো।

বনমালী—

ভৌমিক সাহেব হাঁক দিল।

ভৃত্য বনমালী এসে হাজির হলো।

বনমালী—

সাব—

এই বাবু কাল থেকে এখানে এসে থাকবেন—কাজ করবেন, পারলারের পাশের ঘরটায় এঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিবি আর শিবুকে বলবি এঁর কাছে থাকতে—

জি সাব।

কাল তাহলে কখন আসবেন মিঃ সেন ?

বিকেলের দিকে আসবো—আজ তাহলে উঠি।

আসুন। একটা কথা—আমার স্ত্রী বলতে গেলে প্রায় বাড়ি থেকে বেরোয় না—সব সময় সে বাড়িতেই থাকে, কোনো প্রয়োজন হলে বলতে পারেন।

সৌমিত্র আর কোনো কথা বললো না।

নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো।

॥ ৩ ॥

সৌমিত্রকে মিথ্যে বলেছে সুভাষ।

অফিসে আদৌ দত্ত এণ্ড সন্সের মিঃ দত্ত তাকে ফোন করেননি।

গাড়িতে করে বাড়ি ফেরবার পথে সৌমিত্রর কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যখন নৈনিতালের সে দিনটার কথাটা তার মনে পড়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তেই সে তার সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছিল।

অফিসে সেদিন সে সৌমিত্রকে তার নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে দেখা করতে বলেছিল এইজন্য যে মীরাকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করে তারপর ব্যাপারটা পাকাপাকিভাবে স্থির করবে—

বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে সে সৌমিত্রকে দিয়ে আঁকাবে কি না—

এবং বেণু দত্তকেও জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু তার আগেই সৌমিত্রকে চিনতে পারায় নিজের মনকে সে স্থির করে ফেলেছিল।

এবং মনে মনে ব্যাপারটা স্থির করবার পর থেকেই কেমন যেন একটা নিষ্ঠুর আনন্দে সুভাষ থেকে থেকে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

নৈনিতালের সেই মীরার চিঠি ও সৌমিত্রের ফটো মনের মধ্যে তার যতই কৌতূহল জাগাক, স্পষ্টাস্পষ্টি মীরাকে সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন করেনি।

এমন কি আভাষে ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেনি কখনো তার মনের সন্দেহটা।

কিন্তু প্রকাশ না করলেও তার মনের মধ্যে একটা বিষের জ্বালা যেন বরাবরই ছিল।

সৌমিত্র সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি বা প্রশ্ন করেনি এইজন্য যে ব্যাপারটা সুভাষ ভৌমিকের আভিজাত্য ও সহজ রুচিবোধেও যেন বেধেছে—

সেও এক কথা, তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়েরই আজকের দিন অমন প্রাক-বিবাহ, ভালবাসার ইতিহাস থাকে।

এবং যে ইতিহাসটা প্রায় ক্ষেত্রেই বিয়ের পরে ধীরে ধীরে কখন এক সময় যেন মুছে যায়—ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

তার নিজেরও চার বছরের বিলাত প্রবাসেও কি তেমন কিছু ইতিহাস ছিল না।

কিন্তু তবু মনের জ্বালা—ক্ষোভটা যেন কখনো তার যায়নি।

বিশেষ করে যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল যে মীরা তাকে বিয়ে করলেও মনের দিক থেকে গ্রহণ করতে পারেনি।

মনের দিক থেকে তাদের পরস্পরের মধ্যে দুস্তর একটা ব্যবধান যেন থেকে গিয়েছে।

মীরা তার ঘরণী, স্ত্রী, শয্যাসঙ্গিনী—তবু যেন সে মীরাকে পায়নি।

মীরা যেন তার থেকে অনেক দূরে।

অথচ মীরার ব্যবহারে কথায়-বার্তায় সেটা আদৌ বোঝবার উপায় ছিল না।

ফলে মীরাও যেমন কোনোদিন তার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি, তেমনি সেও মীরার কাছে হতে পারেনি।

আর মনে হয়েছে কেবলই সেজন্য একমাত্র দায়ী কোন এক সৌমিত্র সেন।

সৌমিত্র সেনই তাদের জীবনে গড়ে তুলেছে এক দুস্তর ব্যবধান।

যে ব্যবধানকে তারা কেউ কোনোদিন উত্তীর্ণ হতে পারলো না আজ পর্যন্ত।

সেই সৌমিত্র যখন আকস্মিকভাবে তার সামনে এসে দাঁড়াল—সে বুঝতে পারল—ওই সেই সৌমিত্র।

একটা নিষ্ঠুর পরিকল্পনা তার মনের মধ্যে উদয় হয়।

নিয়ে যাবে সে সৌমিত্রকে—

তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্থান দেবে।

সর্বক্ষণ মীরার চোখে-চোখে সে থাকবে—

তারপর দেখবে তারা কি করে।

মীরা আর সৌমিত্র অতঃপর কি করে।

আর সৌমিত্র।

তারও সেদিন অশোক ইণ্ডাস্ট্রিজে গিয়ে সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হওয়াটা কি একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।

না—অন্য কিছু।

সে কি ইতালী থেকে দীর্ঘকাল পরে ফিরে আসবার পর জানত না যে মীরা আজ কোথায় আছে।

জানত সে।

খবরটা সে আগেই পেয়েছিল—

ল্যান্সডাউন রোডের পিতৃগৃহ ভাড়া দিয়ে, কলকাতা থেকে একটু দূরে নির্জনে শান্ত পরিবেশে নরেন্দ্রপুরে গিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করে কিছুদিন হলো মীরা আর তার স্বামী সুভাষ ভৌমিক নতুন নীড় রচনা করেছে।

সে কি জানত না—

ইতালী থেকে ফিরে ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই সৌমিত্রর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

মীরা—

কতদিন মীরাকে সে দেখে না।

মীরাকে কি একটিবার সে দেখতে পায় না।

ল্যান্সডাউনের পরিচিত বাড়িটার সামনে গিয়ে কয়েক দিন ঘোরাফেরা করলো, তারপর হঠাৎ একদিন জানতে পারল—মীরা সেখানে থাকে না।

এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে নরেন্দ্রপুরে নতুন বাড়ি করে মীরা আর তার স্বামী উঠে গিয়েছে।

ছুটে গেল সৌমিত্র নরেন্দ্রপুরে।

সেখানে সুভাষ ভৌমিকের মত মানুষের বাড়িটা খুঁজে বের করতে দেরি হয়নি—

কিন্তু দিনের পর দিন ঘোরাফেরা করেও মীরার দেখা সে একটি-বারও পেলে না।

পাবে কি করে সে মীরার দেখা।

মীরা তো বাড়ি থেকে কখনো বেরুতো না।

সুভাষের গৃহের কোণে সে যেন স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্বাসন দিয়েছিল।

সুভাষও তাকে কখনো বাড়ি থেকে বের করতে পারেনি।

শেষটায় বাধ্য হয়ে সুভাষকেও বাড়ির মধ্যেই বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়েছে।

কত ভাবেই না চেষ্টা করেছে সুভাষ।

চলো না একটু বেড়িয়ে আসি মীরা—

মীরা বলেছে, না।

কেন, না কেন!

আমার ভাল লাগে না—

বাইরে বেরুতে তোমার ভাল লাগে না!

না, লাগে না।

আশ্চর্য!

এতে আশ্চর্যের কি আছে—

নয় তো কি—বিয়ের আগে তো যখন তখন বেরুতে, নিজের গাড়ি নিয়ে সারা কলকাতা শহর চষে বেড়াতে—কথাটা তো মিথ্যে নয়।

মিথ্যে হবে কেন।

তবে—

এখন ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না—না এ তোমার একটা জিদ।

ওকথা বলছো কেন! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি অনেক কিছুই তুমি আমাকে করতে বাধ্য করো না!

মীরা—

হ্যাঁ, তেমনি জোর করে নিয়ে গেলেই পারো।

সুভাষ বলেছে, না, দরকার নেই তার।

পরের দিন ঠিক সন্ধ্যার মুখেই সৌমিত্র তার একটা বড় ও একটা ছোট সুটকেশ নিয়ে সুভাষ ভৌমিকের নরেন্দ্রপুরের 'ছোট্ট নীড়ে' এসে হাজির হলো।

নামেই 'ছোট্ট নীড়' কিন্তু বিরাট তার পরিধি।

প্রায় একবিঘে জমি নিয়ে ছোট্ট নীড়।

কাঠা চারেক জায়গা নিয়ে একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, বাদবাকি জায়গায় সামনে ও পেছনে বিরাট লন ও বাগান।

টেনিস কোর্ট ও সুইমিং পুল পর্যন্ত আছে।

বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরের দিকেই বাড়িটা। এবং গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটার আসল চেহারা অনুমান করা যায় না।

গেট পার হলেই নুড়িঢালা পাথরে দু'পাশ বিস্তৃত লন এবং শীতের মৌসুমী ফুলের রং-বেরং বাহার।

শীতের বেলা শেষ হয়ে গেলেও সন্ধ্যা তখনো ঘনায়নি, চারদিকে কেবল একটা ম্লান ধূসরতা যেন বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

আলোছায়ার একটা লুকোচুরি যেন চলেছে।

ট্যাক্সিটাকে গেট থেকে বিদায় করে দিয়ে সৌমিত্র দু'হাতে দুটো সুটকেশ নিয়ে এগুতে যাবে—দরোয়ান এগিয়ে এলো—

দিজিয়ে সাব, ম্যায় পৌঁছা দেতেহেঁ।

সৌমিত্র দরোয়ানের হাতে সুটকেশ দুটো ছেড়ে দিল।

আগে আগে দরোয়ান ও পেছনে পেছনে সৌমিত্র এগিয়ে যায়।

মাথা নিচু করেই এগুচ্ছিল সৌমিত্র, হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখা হয়ে গেল।

একটা পাতলা কমলালেবু রংয়ের শাল গায়ে মীরা সন্ধ্যার ম্লান আলোয় একটা চপ্পল পরে লনের সবুজ ঘাসের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল।

সৌমিত্র তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে মীরাও চলা থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল।

দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য বুঝি দুজনেই দাঁড়ায় যে যার জায়গায়, তারপব সৌমিত্রই চোখ নামিয়ে নিয়ে দরোয়ানের পেছনে পেছনে আবার এগিয়ে যায়।

সাড়া পেয়ে বনমালী আর শিবু এসে হাজিব হয়।

বনমালীর বয়স হয়েছে কিন্তু শিবুর বয়স তিরিশের মধ্যে।

কালো গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, বেশ হাসিখুসি।

পরনে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়।

নমস্কার বাবু—

বনমালীই বললে, বাবু এই শিবু—সাহেব একেই আপনার কাছে থাকতে বলেছে।

তোমার নাম শিবু!

আজ্ঞে, শিউচরণ—

বাড়ি কোথায়?

বেহারে—তবে আমি বাংলা বলতে পারি, বুঝতে পারি বাবু—

বাঃ! তবে তো খুব ভাল।

শিউচরণই দরোয়ানের হাত থেকে সুটকেশ দুটো নিয়ে করিডোর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আসুন বাবু—

ঘরটা বেশ প্রশস্তই।

ঘরের সঙ্গে এটাচড বাথরুম।

দক্ষিণটা খোলা—লন, বাগান, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল।

আর ছোট একটা অর্কিড হাউসও আছে।

বনমালী ও শিবু দুজনে মিলে ঘরটা একেবারে ছিমছাম করে সাজিয়ে রেখেছিল।

সৌমিত্রর বেশ পছন্দ হয়ে যায়।

বাবু, সব ঠিক আছে তো ?

হ্যাঁ শিবু, সব ঠিক আছে।

বাবু—একটা কথা—

কি বলো—

এ বাড়িতে বাবুর্চির হাতের রান্না। আপনি খাবেন তো ?

কেন বলো তো—নিশ্চয়ই খাবো। না—না, ওসব জাতটাতের মাথাব্যথা আমার নেই। সবার হাতে খেতে পারি। পরিষ্কার করে রেঁধে দিলে ডোম-মুচি-মুদ্দাফরাস কারো হাতে খেতে আমার আপত্তি নেই শিবু, বুঝেছো।

না—মানে মা কথাটা জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন কিনা।

একটু থেমে থেমে বলে শিবু।

মা—

আজ্ঞে এ বাড়ির মা—

শিবু আবার একটু থেমে বলে, মানে ভৌমিক সাহেবের মেমসাহেব।

তাকে তোমরা মা বলো নাকি ?

আজ্ঞে—ওঁকে কেউ মেমসাহেব বলে ডাকে উনি পছন্দ করেন না তাই ওঁকে আমরা সকলেই মা বলেই ডাকি।

ঠিক আছে—তুমি এখন এসো শিবু, এখন আর তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।

সৌমিত্রর হলে ওই যে দেওয়ালে কলিং বেল আছে বাজাবেন
তখাবো।

বেশ।

শিউচরণ বেরিয়ে গেল।

ধবধবে বিছানা, দেখেই মনে হয় দামি চাদর-বালিশ ওয়াড়-গুলোতেও সূক্ষ্ম সূঁচের কারুকাজ করা।

বিছানার ওপর বসতেই সৌমিত্র বুঝতে পারে—তলায় ডানলো-পিলো পাতা আছে, তারও নিচে স্প্রিং লাগানো।

মৃদু হাসলো সৌমিত্র।

ঐশ্বর্যের বিলাস।

জীবনের অনাবশ্যক বাহুল্য।

সুভাষ ভৌমিকের অর্থের প্রাচুর্য আছে বাড়িঘর দেখেই বোঝা যায়।

আর থাকবেই বা না কেন, এ-এস-আই অর্থাৎ অশোক স্টিল ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

ভাগ্যদেবতা তাই অকৃপণ হাতে ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দনীয় গৃহলক্ষ্মীকেও হাতে তুলে দিয়েছেন।

সৌমিত্র ভেবেছিল ভৌমিক সাহেব সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে তাকে হয়তো ডেকে পাঠাবেন।

কিন্তু কোনো ডাক এলো না।

রাত ন'টায় শিউচরণ এলো।

খাবার কি এখন দেবো বাবু?

খাবার এনে টেবিলের ওপর ঢেকে রেখে দাও, পরে খাবো'খন।

সৌমিত্র মৃদুকণ্ঠে বলে।

খাবার তো তাহলে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাবু—

তা হোক, তুমি এনে রেখে দাও ঢাকা দিয়ে।

শিবু বেরিয়ে যাচ্ছিল—পেছন থেকে সৌমিত্র বলে, সাহেব ফেরেননি শিবু—

হ্যাঁ—সে তো অনেকক্ষণ। লনে বসে আছেন।

আমার কথা বলেছিলে ?

আজ্ঞে বনমালী বলেছে।

ও, আচ্ছা যাও।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সৌমিত্র ভাবছিল অন্ধকারের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে চেয়ে—

মীরার একটিবার দেখা না পেয়ে মনে মনে যখন অস্থির হয়ে উঠেছে সৌমিত্র—

সেই সময়ই একদিন সে নিজেই দত্ত এণ্ড সন্সয়ের অফিসে বেণু দত্তর সঙ্গে দেখা করতে যায়।

বেণু দত্ত এককালে সৌমিত্রর সহপাঠী ছিল।

আর্ট স্কুলে তুজনে একসঙ্গেও কিছুকাল পড়েছিল।

তারপর হঠাৎ বেণু দত্ত আর্ট স্কুল ছেড়ে দিয়ে তার বাবার পাবলিসিটি অফিসে ঢুকে পড়ে।

ফাইন আর্টস দিয়ে কি হবে—কমার্শিয়াল আর্ট ছাড়া পেট ভরবে না—

অতএব বেণু দত্ত পুরোপুরি কমার্শিয়াল আর্টিস্টই হয়ে [illegible] ঠেছিল।

সংবাদপত্রে বেণু দত্ত দেখেছিল সৌমিত্র [illegible] ফি[illegible] তার সঙ্গে সরল

কিন্তু জানে না সে কোথায় থাকে।

এমন সময় সৌমিত্রই এলো একদিন

করতে।

তাহলে পুরোনো দিনের কথা এখনে[illegible] লত ফেরত সুভাষ ভৌমিক।

[illegible] স তো ভৌমিক সাহেবের কাছা-

বেণু দত্ত বলে।

তোর কি মনে হয় ?

যাক—কোথায় উঠেছিস?

সেই পুরাতন মেসে।

সত্যি—

হুঁ।

এখন কি করবি?

হাত তো খালি, দেখি একটা কাজ যদি জোগাড় হয়—

সত্যি কাজ করবি?

বাঃ, না করলে খাবো কি?

সিরায়াস!

হুঁ—সেণ্ট পারসেণ্ট—

বাড়ির দেওয়ালে ফ্রেসেকোর কাজ করবি?

কেন করবো না—

তাহলে শোন, আমার হাতে একটা পার্টি আছে।

বেশ তো—দে না।

সুভাষ ভৌমিকের নাম শুনেছিস—অশোক ইণ্ডাস্ট্রিজের? তারই নতুন বাড়ি 'ছোট্ট নীড়'!

ওই নামদুটো শুনেই চমকে উঠেছিল সৌমিত্র—

সুভাষ ভৌমিক—'ছোট্ট নীড়'—

ওই ছোট্ট নীড়েই তো থাকে মীরা—

ফিরে ও... সঙ্গে দেখা হবে—

কিন্তু কো... রে দেখা হবে—এমন অপূর্ব যোগাযোগ, এ যে

রাত ন'টায় শিউচর... ল।

খাবার কি এখন দে... ? করবি তো কাজটা বল।

খাবার এনে টেবিলের ...

সৌমিত্র মৃদুকণ্ঠে বলে।

খাবার তো তাহলে একেবা...

তা হোক, তুমি এনে রেখে ... মক সাহেবের ওখানে একবার।

আজই—

শুভস্য শীঘ্রম—যা ওঠ, তারপর সন্ধ্যেবেলা আমার [illegible] আসবি।

শোন, সোজা গিয়ে নাম করে স্লিপ দিবি—তারপর ডাকলে বলবি আমার কথা।

ভৌমিক সাহেবকেও একটিবার দেখবার ইচ্ছা মনে মনে ছিল বৈকি।

মীরা শেষ পর্যন্ত কার গলার মালা দিল—

কার জন্য মীরা তাকে ভুলে গেল অমন করে—

শুধু ভোলাই নয়, অমন করে সেদিন অপমান পর্যন্ত করতে পারলো।

ভয়ের কিছু নেই।

ভৌমিক সাহেব তাকে কোনোদিন দেখেনি—নামও শোনেনি তার, তাকে চেনবারও কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অতএব সেদিক দিয়ে সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ভৌমিক সাহেব কথা বলতে গিয়ে তার দিকে অমন করে চেয়েছিল কেন!

মনে হলো ভ্রূ-দুটো যেন তার মধ্যে মধ্যে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

তারপর অবিশ্যি কিছুক্ষণ পরে ভৌমিক সাহেব তার সঙ্গে সরল ও সহজভাবেই কথা বলেছে।

নিঃসন্দেহে মীরার নির্বাচন ভুল হয়নি।

সত্যিই তো—তুলনা হয় নাকি?

কোথায় সে আর কোথায় ওই বিলেত ফেরত সুভাষ ভৌমিক।

চেহারায় আভিজাত্যে অর্থে সে তো ভৌমিক সাহেবের কাছাকাছিও যেতে পারে না।

মীরা সুভাষকে ছেড়ে তার মত একটা শিল্পীর গলায় মালা দিতে যাবেই বা কেন।

মীরার তো আর সত্যি-সত্যিই মাথা খারাপ হয়নি।

বড়লোকের একমাত্র সন্তান—

লেখাপড়ায় রূপে আভিজাত্যে রুচিতে তুজনের মধ্যে তাদের কত পার্থক্য ছিল।...

আশ্চর্য!

ওই মীরাকে সে কামনা করেছিল।

পাগল—সত্যিই পাগল সে।

তু'দিনেই মোহ শেষ হতো—স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

তারপর নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাকি জীবনটা ব্যর্থতা আর আপশোষের গ্লানি কেবল বহন করে যেতে হতো তুজনকেই।

তাই—তাই হঠাৎ ভৌমিক সাহেবের মুখোমুখি বসে সৌমিত্রর মনে হয়েছিল—ভুল করেছে মীরাকে একটিবার দেখবার লোভে এতদূর একটা অন্ধ নেশার ঘোরে এগিয়ে এসে।

একবার ওই সময় মনেও হয়েছিল সৌমিত্রর, ফিরে যাবে সে—

ভৌমিক সাহেব যদি রাজীও হয় তার প্রস্তাবে, তথাপি শেষ পর্যন্ত সে 'সুখ নীড়ে' যাবে না।

ওদের সে সুখের নীড়ে গিয়ে প্রবেশ করবে না।

শান্তির একটা সংসার হয়তো, কেন সে ধূমকেতুর মত গিয়ে প্রবেশ করবে সেখানে।

অনাহূত—নির্লজ্জের মত, ভিক্ষুকের মত—ছিঃ ছিঃ!

হয়তো মীরা ঘৃণায় তার দিকে তাকাবেও না।

মনে মনে বলবে—এই তুমি, এই তোমার পরিচয়, এত ছোট, এত সঙ্কীর্ণ মন তোমার।

কিন্তু পারেনি সৌমিত্র।

শেষ পর্যন্ত মীরাকে একবার দেখবার লোভটা সম্বরণ করতে পারেনি।

মীরা—মীরা—

মীরাকে সে কতদিন দেখেনি।

কেমন দেখতে হয়েছে আজ মীরা।

তার সেই মানসী প্রতিমা আজ বড়লোকের গিন্নি।

খুব মুটিয়েছে হয়তো।

তার স্বপ্নের সঙ্গে হয়তো আজ কিছুই মিলবে না।

মীরা—সে মীরা আর নেই।

॥ ৪ ॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন তা পারলো না সৌমিত্র—

আশ্চর্য।

কেন পারলো না।

দীর্ঘদিন পরে আবার সেই মীরার সান্নিধ্যটুকু পাওয়ার লোভেই কি?

মীরা—

সেই মীরা এখন পরস্ত্রী—

ছিঃ ছিঃ, অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এই লোভটুকু সৌমিত্রর জয় করা উচিত ছিল।

মীরাই বা কি ভাবছে।

নিশ্চয় ঘৃণায় সে পাথর হয়ে গিয়েছে।

মৃদু একটা খস খস শব্দ—

ঘরের সামনে অন্ধকার করিডোরে দাঁড়িয়েছিল সৌমিত্র।

মৃদু খস খস শব্দটা শুনে পেছন ফিরে তাকাল।

অন্ধকার হলেও একটা ঝাপসা মূর্তি তার চোখে পড়ে।

তার পরই মৃদু—অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে একটা ডাক শোনা গেল।

সৌমিত্র—

কে?

আমি মীরা।

মীরা—

হ্যাঁ, এখানে এসেছো কেন?

কণ্ঠস্বরে একটা স্পষ্ট বিরক্তি যেন প্রকাশ পায়।

মীরা—

আমি জানতে চাই কেন এখানে এসেছো—

পুনরায় বাধা দিয়ে মীরা বলে একপ্রকার যেন সৌমিত্রকে থামিয়ে দিয়েই।

হঠাৎই যেন সৌমিত্রর বুকের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে।

মীরার ক্ষণপূর্বের কণ্ঠস্বরটা যেন তাকে নিষ্ঠুর করে তোলে।

ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে সৌমিত্র বলে ওঠে, কেন, তোমার স্বামীর কাছে শোননি, তোমাদের বাড়ির দেওয়ালে—

কথাটা সৌমিত্রর শেষ হলো না, মীরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, কোনো দরকার নেই তার।

দরকার নেই তা আমাকে কথাটা বলতে এসেছো কেন? যাও, তোমার স্বামীকে গিয়ে কথাটা বলো না।

সৌমিত্র—

হ্যাঁ, তাকেই বলো।

কথাটা বলে সৌমিত্র আর দাঁড়ালো না। ঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

দাঁড়াও, শোনো। তোমাকে কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে—

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন বলুন।

যেতেই হবে।

তা কি করে সম্ভব বলো। একটা কনট্রাক্ট নিয়ে এসেছি—

শোনো, টাকার যদি তোমার প্রয়োজন থাকে বলো—কত চাও, আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি তোমায়—কালই তোমায় চলে যেতে হবে।

মীরার কথাটা যেন অকস্মাৎ সৌমিত্রকে আরো নিষ্ঠুর করে তোলে। বলে, মীরা দেবী, তোমাদের অনেক টাকা আমি জানি, দু'হাতে তুমি সে টাকা মুঠো মুঠো করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে পারো—যাকে খুসি বিলোতেও পারো কিন্তু আমি তাদের একজন হয়ে সে টাকা তোমার কাছে হাত পেতে নেবো, ভাবলে কি করে?

থামো, টাকার জন্যেই তো তুমি এ কাজ নিয়েছো—ছবি এঁকে টাকা নেবার জন্যেই তো এসেছো—আসোনি?

তাই যদি হয় তো সে টাকা তোমার কাছ থেকে নেবো কেন। ভৌমিক সাহেব আমাকে কাজ দিয়েছেন, তিনিই দেবেন—

কিন্তু এখানে তোমার থাকা হবে না—এখান থেকে তোমাকে চলে যেতেই হবে।

তোমার হুকুম নাকি মীরা দেবী—

তাই যদি মনে করো তো তাই।

সৌমিত্র মৃদু হাসে—

যদি না যাই।

হঠাৎ মীরার গলার স্বর যেন বদলে গেল।

কান্নায় যেন ভারি হয়ে এলো গলার স্বর।

সৌমিত্র, প্লিজ।

সৌমিত্র মৃদু হাসলো আবার।

তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, মীরা দেবী! অনেক রাত এখন—

যদি কেউ দেখে ফেলে সেটা আমার পক্ষে যাই হোক তোমার পক্ষে হয়তো ভাল হবে না। যাও, নিজের ঘরে যাও।

না, আমি যাবো না।

মীরা দেবী—

যাবো না—আগে বলো, সকাল হওয়ার আগেই এখান থেকে তুমি চলে যাবে।

তুমি যাও মীরা দেবী—

না। আগে বলো—

মনে হয় যেন সৌমিত্রর—মীরা একটা চাপা কান্না রোধ করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

যাও মীরা, ঘরে যাও—ব্যাপারটা আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও।

সৌমিত্রর কথা শেষ হলো না—করিডোরের অন্য প্রান্তে যেন কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। এদিকে নিশ্চয় কেউ আসছে, হয়তো—

মীরা, প্লিজ, যাও এখান থেকে।

সৌমিত্র—

যাও।

মীরা অতঃপর ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

সৌমিত্র আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পায় না—তাড়াতাড়ি এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

মীরা—

ঠিক এমনি করে আর-এক শীতের মধ্যরাত্রে মীরা তার মেসের ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

আর ঠিক এমনি করেই সে খেলার ভেতর দিয়ে আমি যেন মীরা। আমি ছবি দেবো একজিবিশনে,

কি অনুরোধ যেন করেছিল।

একটা ছবি রাত জেগে শেষ করছিল।

পরের দিন একজিবিশনে সে ছবিটা

জীবন-মরণের পরীক্ষা দিতে হবে সেই ছবিটা দিজন্যই যখন দেবে তখন

হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে চমকে উঠে।

কে—

আমি—দরজাটা খোলো।

কে—

পুনবায় প্রশ্ন করে সৌমিত্র। 'গাপন গর্ব-

আমি—আমি মীরা।

রীতিমত বিস্মিত হয়ে গিয়েই দরজাটা খুলে দিয়েছিল সৌ-পারে,

সর্বাঙ্গে একটা কালো গরম শালে আবৃত মীরা তার সা-

দাঁড়িয়ে।

শালের রংটা আজও মনে আছে সৌমিত্রর।

ডিপ ব্ল্যাক—ঘন কালো আর তারই ওপরে লাল সুতোর সূক্ষ্ম কলকার কাজ করা।

মীরা তখন হাঁপাচ্ছে।

খুব দ্রুত বোধহয় পথ অতিক্রম করে এসেছে তাই হাঁপাচ্ছে।

ওই শীতের রাত্রেও কপালে বিন্দু বিন্দু মুক্তোর মত ঘাম টলটল করছে।

মুক্তোই।

কপালের সেই ঘামের বিন্দুগুলোর ওপর আলো পড়ে যেন হচ্ছিল—সেগুলো কয়েকটা টলটলে মুক্তো।

চিরদিন শ্যাম্পু করা অভ্যাস মীরার—কয়েকটা চূর্ণ কুন্তল। মুক্তোর মত ঘামের বিন্দুগুলোর পাশে লেপটে আছে।

হ্যাঁ মীরা, ওর রং ও তুলির খেলার ভেতর দিয়ে আমি যেন আমাকে খুঁজে পাই। তবে এবারে আমি ছবি দেবো একজিবিশনে, কিন্তু কেন জানো ?

কেন—

শুধু তোমার জন্যে।

বেশ তাই দিও—মনে থাকে যেন, আমার জন্যই যখন দেবে তখন পুরস্কারটাও কিন্তু আমার।

তাই হবে, আর নিন্দা হলে আমার।

দুজনে হেসে উঠেছিল।

কিন্তু মুখে যাই বলুক সৌমিত্র, মনের মধ্যে একটা গোপন গর্ব-বোধ তাকে তখন উত্তেজিত করে তুলছিল।

তার ছবি যদি একজিবিশনে বরমাল্য অর্জন করে আনতে পারে, সে বরমাল্য কি মীরার হাত দিয়েই তার গলায় এসে দুলবে না।

সেদিনকার সেই মুহূর্তের মীরার সেই শান্ত সুন্দর হাসি—

সে হাসিতে কি তারই জয়ের ইতিহাস লেখা থাকবে না চিরন্তন হয়ে।

অপ্রাপনীয়া ধনীর দুলালী মীরা—আজও যে তার কাছে স্বপ্ন বলেই মনে হয়—

সেই মীরা কি আরো তার নাগালাজের মধ্যে এসে দাঁড়াবে না তার তার জয়ের মধ্যে দিয়ে।

তাছাড়া তার ভালবাসাকে খুসি করা কি তার কর্তব্য নয়।

আর হারবেই বা সে কেন।

পারবেই বা না কেন সে !

নিশ্চয়ই তার আঁকা ছবি পুরস্কার পাবে।

মনের মধ্যে আশ্চর্য একটা উৎসাহ যেন বোধ করছিল তখন।

কি এক স্বপ্নে মনটা যেন তার দুলে উঠেছিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে তার মন স্থির করে ফেলেছিল—

না, আর দেরি নয়।

একজিবিশনে ছবি সাবমিট করবার আর সামান্য ক'দিনই মাত্র বাকি আছে তখন।

ইজেলের সামনে এসে দাঁড়ায় সৌমিত্র যেন মনের মধ্যে এক নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

তারপর শুরু হয় তার আঁকা।

দিন নেই, রাত নেই—

এঁকে চলেছে সৌমিত্র।

তুলি রং আর ইজেল—রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে তার কল্পনা, তার স্বপ্ন ইজেলের গায়ে শাদা ক্যাম্বিসের ওপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে।

আহার নেই, বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই—

এঁকে চলেছে সৌমিত্র।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়ে পড়েছে—

মাথায় রুক্ষ চুল।

মাঝখানে প্রায় দশ-বারোটা দিন চলে গেছে। ওই দশ-বারো দিনের মধ্যে যে একবারও মীরা সেই দিনের পর আর দেখা করতে আসেনি সে কথাটাও যেন মনে পড়েনি সৌমিত্রর।

মীরা আসে না।

মীরা আসেনি—

আর সত্যি কথা বলতে কি, মীরার কথা বুঝি ওই ক'দিন মনেও পড়েনি সৌমিত্রর।

মনে পড়লে পরবর্তীকালে সৌমিত্র ভেবেছে—নিশ্চয়ই সে মীরার খোঁজ করতো।

দশ-বারো দিন মীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না—একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার বৈকি।

এবং কথাটা একবারও মনে হলে সে নিশ্চয়ই বুঝতো—

এমনও হয় না—এমনও হবার কথা নয়।

সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে, নিজের মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে ডুবে না থাকলে সৌমিত্রর কথাটা নিশ্চয়ই মনে পড়তো।

সে-ই ছুটে যেত একটা সংবাদ নিতে—

কিম্বা মীরার বান্ধবী অরুণার কাছে একটা টেলিফোন করে জানতো।

কিন্তু সে কথাটাও মনে পড়েনি।

আর ঠিক সেই সময় এক মধ্যরাত্রে একান্ত যা অস্বাভাবিক—মীরার আবির্ভাব ঘটলো তার মেসের ঘরে।

গত রাত থেকে একটিবারও বিছানায় যায়নি সৌমিত্র—

ইজেলের সামনে ছবিটার গায়ে তুলির সাহায্যে ফাইন্যাল টাচ-গুলো দিচ্ছিল—

ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—

হঠাৎ মীরার গলা শোনা গেল—

॥ ৫ ॥

সৌমিত্র—

ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল।

গভীর রাত—

মেসের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারা মেসের মধ্যে একমাত্র প্যাসেজের—সিঁড়ির ও সৌমিত্রর ঘরের আলো জ্বলছিল।

দরোয়ান মীরাকে মেসে আসতে বাধা দেয়নি—

ডাকতেই কোলাপসিবল গেটটা খুলে গিয়েছিল।

মীরা আসে এ মেসে যখন তখন সৌমিত্রর ঘরে দরোয়ান জানত, তাছাড়া প্রায়ই সে মীরার কাছ থেকে বকশিস পেত।

আর সেই কারণেই মীরার প্রতি সে একটু বিশেষ প্রসন্নই ছিল।

গেট দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে মীরা সোজা দোতলায় এসেছিল।

ঘরের দরজাটা ঈষৎ ভেজানো—

এবং ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

মীরাকে দরজায় ধাক্কা দিতে হয়নি বা সৌমিত্রকে ডাকতেও হয়নি, ভেজানো দরজা ঠেলেই সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

সৌমিত্র—

ধ্যানমগ্ন সৌমিত্রর কানে প্রথম ডাকটা পৌঁছায় না।

দ্বিতীয়বার ডাকতেই ফিরে তাকালো।

সৌমিত্র—

এ কি, তুমি!

হ্যাঁ—

মীরা তখন বেশ হাঁপাচ্ছে।

কি ব্যাপার মীরা। এত রাত্রে—কি হয়েছে মীরা! মনে হচ্ছে তুমি হাঁপাচ্ছো, যেন খুব দ্রুত এসেছো পায়ে হেঁটে অনেকটা পথ। বসো—বসো।

অগোছালো ঘরের এক কোণ থেকে মীরার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দেয় সৌমিত্র।

আবার অনুরোধ জানায়, বসো মীরা।

মীরা কিন্তু বসে না, দাঁড়িয়ে থাকে।

শীতের রাত্রেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ঘামের বিন্দুগুলো আলোয় মুক্তোর মত টল টল করছে।

তোমার গাড়ির শব্দ তো পেলাম না!

গাড়িতে তো আসিনি।

মৃদুকণ্ঠে মীরা জবাব দেয়।

তবে—

পায়ে হেঁটে এসেছি।

পায়ে হেঁটে এসেছো—

কথাটা বলে সৌমিত্র মীরাব মুখের দিকে তাকালো।

তার বিস্ময়েব যেন অবধি নেই।

কি বলছে কি মীবা।

মীরা পায়ে হেঁটে এসেছে সেই ল্যান্সডাউন রোড থেকে এতটা পথ।

অশোক ইণ্ডাস্ট্রিজেব ম্যানেজিং ডাইরেক্টাব রায়বাহাদুব অশোক মিত্র যাব বাপ, যাব একমাত্র সন্তান সে এবং যাদেব বাড়িতে সর্বদা পাঁচ-ছ'খানা গাড়ি মজুত থাকে, দুজন ড্রাইভার মাইনে পায়—সে এতটা পথ হেঁটে এসেছে।

তাছাড়া মীরার নিজেরও তো সর্বদা ব্যবহারের জন্য একখানা গাড়ি আছে।

সে নিজেও ড্রাইভিং জানে এবং বেশির ভাগ নিজেই ড্রাইভ করে।

মীরা এত রাত্রে পায়ে হেঁটে এসেছে—ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বৈকি ?

জীবনে আজ পর্যন্ত সে ক' পা হেঁটেছে বলতে গেলে তাকে ভেবে বলতে হবে।

বিশ্বাস করবার মত নিশ্চয়ই না ব্যাপারটা এবং বিস্ময়েবও তাই।

সৌমিত্র তাই বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে শুধোয় আবার, বলো কি—সেই ল্যান্সডাউন থেকে কালিঘাটে!

হ্যাঁ—

মীরা হাঁপাচ্ছে তখনো।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে।

বসো, বসো মীরা—

আবার অনুরোধ জানায় সৌমিত্র, আবার চেয়ারটা সামনে আর একটু ঠেলে দেয় মীরার দিকে।

মীরা কিন্তু তবু বসে না, বলে, না সৌমিত্র, বসবার সময় নেই—এখুনি আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে বাড়িতে—

তা এমনি করে না ছুটে এসে আমাকে একটা খবর দিলেই তো পারতে।

পারতাম কিন্তু তার সময় নেই বলেই—

মীরা—

কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল সৌমিত্র সেদিন।

হ্যাঁ সৌমিত্র, কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটেই।

কি হয়েছে মীরা, মনে হচ্ছে কিছু যেন একটা ঘটেছে।

সেসব শোনার তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি—মানে তোমাকে আজ রাত্রেই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে সৌমিত্র।

কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো, আজ রাত্রেই—

বোকার মতই যেন প্রশ্নটা করে তাকায় সৌমিত্র মীরার মুখের দিকে।

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন, কি হয়েছে যে যাবো।

আঃ সৌমিত্র, কেন তর্ক করছো। যা বলছি শোনো, এখুনি তুমি বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে।

তা নয় হলো কিন্তু—

আঃ, আবার কিন্তু—দেরি হয়ে যাচ্ছে সৌমিত্র, প্লিজ, তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি—

কিন্তু কেন যাবো তাও জানতে পারবো না।

সৌমিত্র, প্লিজ—আমি বলছি যেতে, সেজন্যও কি তুমি চলে যেতে পারো না।

পারি মীরা—পারি নিশ্চয়ই পারি।

চলো তবে—চলো, বেরিয়ে পড়ো।

বেশ যাবো। কারণও না হয় জিজ্ঞাসা করলাম না কিন্তু এক-জিবিশনে ছবিটা দেবার কি হবে? তোমার কথায় ছবিটা প্রায় আজ দশটা দিন দশটা রাত খেটে…

ইজেলের ওপর ছবিটা দেখিয়ে বলে, দেখ ওই যে, প্রায় শেষ করে এনেছি। ছবির নামটা কি রাখবো জানো, মধুছন্দা—

সৌমিত্র, তুমি বুঝতে পারছো না। ছবির কথা ভুলে যাও এখন, ছবির কথা থাক—

মীরা আবার বাধা দেয়।

ছবির কথা ভুলে যাবো!

হ্যাঁ—এখন দেরি করবার আর সময় নেই—

তারপরই হাতঘড়ি দেখে বলে, রাত প্রায় একটা বাজে—প্লিজ সৌমিত্র, চলো বেরিয়ে পড়ো।

ছবিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে মীরা, কিছু টাচ দিতে কেবল বাকি—মনে হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারবো।

ও এখন থাক—

বলে মীরা।

আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মীরা, তার পরই ছবিটা অতীনের কাছে দিয়ে বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু মীরা, তুমি—

আমি—

হ্যাঁ তুমি, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে তো?

তোমার সঙ্গে—

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে।

আমি—আমি মানে হ্যাঁ যাবো বৈকি—নিশ্চয়ই যাবো, কিন্তু—

মীরা যেন হঠাৎ কেমন থেমে যায়।

বলো মীরা—

কেমন এক প্রত্যাশা নিয়ে যেন মীরার মুখের দিকে তাকায় সৌমিত্র।

আমি যাবো—নিশ্চয়ই যাবো, কিন্তু—

একটু থেমে ইতস্তত করে বলে মীরা, মানে এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারছি না সৌমিত্র।

কেন মীবা ?

কারণ আছে—

ধীরে ধীরে মীরা বলে।

কি কারণ ?

সৌমিত্র আবার তাকাল মীরার মুখের দিকে।

এই মুহূর্তে তোমাকে আমি সেটা বলতে পারছি না।

বেশ, বলো না, কিন্তু কোথায় আমাদের সঙ্গে তাহলে দেখা হবে সেটা তো অন্তত একটা ঠিক করে নিতে হবে যাবার আগে।

তুমি গিয়ে আমাদের বান্ধবী যে পার্ক স্ট্রীটে অরুণা সেন আছে, তার ঠিকানায় চিঠি দিও একটা। সেই চিঠি পেলেই—

তুমি চলে যাবে ?

হ্যাঁ।

তোমার বাবাকে জানাবে না ?

আপাতত নাই বা জানালাম—

না মীরা, তেমন করে তোমায় আমি পেতে চাই না। চোরের মত ভীরুর মত লুকিয়ে—না, তার চাইতে তোমার বাবার সামনা সামনিই—

না, না—না সৌমিত্র, অমন কাজও করো না।

কেন মীরা, তুমি আমায় ভালবাস—আমি তোমায় ভালবাসি, এর মধ্যে তো কোনো অন্যায় নেই।

তা হোক। আর তাছাড়া বাবার কাছে তোমার যাবার দরকারই বা কি, আমি যখন বলছি চলে আসবো—

কিন্তু তারপর তোমার বাবা তোমার-আমার ওই গোপনতাকে যদি না ক্ষমা করেন ?

করবেন, নিশ্চয়ই করবেন। সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

কিন্তু মীরা, অমনি করে তোমায় পেতে আমার মন চাইছে না।

ওসব কথা এখন থাক সৌমিত্র। তুমি আর দেরি করো না, বেরিয়ে পড়ো এখুনি।

আমার এই বাসা—জিনিসপত্র—ছবিগুলো—আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম—

আঃ, কেন ব্যস্ত হচ্ছো—আমি সব দেখবো, ব্যবস্থা করবো। কিছু নষ্ট হবে না।

সৌমিত্রকে যেন সে রাত্রে মীরা কোনো কথাই বলতে আর দেয়নি।

কোনো কথাই তার আর যেন শুনতে চায়নি।

একপ্রকার যেন ঠেলে তাকে অতঃপর ওই মাঝরাত্রে বের করে দিয়েছিল পথের ওপর।

সৌমিত্র কোনোমতে জামাটা গায়ে দিয়ে, আলোয়ানটা তার ওপর চাপিয়ে মীরার সঙ্গেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল ঘরের দরজায় তালাটা দিয়ে।

নিশুতি শীতের রাত।

রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোথায়ও কোনো জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

একেবারে যেন খাঁ খাঁ করছে।

আর কি প্রচণ্ড শীত সে রাত্রে, মাঘ মাসের মাঝামাঝি মনে আছে সেটা আজও সৌমিত্রর।

একটা হাওয়া বইছিল, সেই হাওয়ার জন্যই বোধহয় আরো শীত করছিল।

সৌমিত্র—

বলো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওরা কথা বলছিল।

তোমার সঙ্গে—মানে কিছু মনে করো না, টাকা আছে তো? না থাকে তো—

বলতে বলতে সুদৃশ্য হ্যাণ্ডব্যাগটা থেকে এক গোছা নোট বের করে মীরা, এই টাকাগুলো—

না—না, টাকা আমার পকেটে আছে। কয়েক দিন আগেই একটা কালার পোর্ট্রেট এঁকে চারশো টাকা পেয়েছি। সে টাকাটা প্রায় সবই আছে, কিছুই খরচ করিনি—আমাদের হনিমুনের জন্য—

তা হলেও আরো কিছু রাখো না—

কথাটা থামিয়ে দিয়েই আবার বলে মীরা, আরো হাজারখানেক।

না, কি হবে অত টাকা দিয়ে।

রাখলে পারতে—টাকার কত দরকার মানুষের। তাছাড়া—

না।

ওই সময় হঠাৎ মীরা পথের মাঝে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, তাহলে চলি।

চলি মানে। এই রাত্রে একা যাবে তাই কখনো হয় নাকি। চলো, বাড়িতে তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাই।

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে মীরা, না না—কোনো প্রয়োজন হবে না। একাই যেতে পারবো আমি।

অন্ধকার জানলাটার সামনে নিজের শোবার ঘরে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল মীরা।

আজ একটু বেশি ড্রিঙ্ক করেছে সুভাষ—

সুভাষের নাক ডাকার শব্দ পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে।

বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে মীরা তার ঘরে।

সৌমিত্রকে কাল সন্ধ্যারাত্রি থেকে দেখা অবধি বুকের মধ্যে যেন একটা অসহ্য কাঁপুনী শুরু হয়েছে মীরার।

সৌমিত্র।

এতকাল পরে হঠাৎ কোথা থেকে এলো সৌমিত্র।

সৌমিত্রর খবর সে সব সময়ই রাখতো।

বিয়ের কিছুদিন আগেই সৌমিত্র কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তারপর চলে গিয়েছিল সুদূর ইতালীতে তাও জানত মীরা।

তার বান্ধবী অরুণার কাছ থেকেই সংবাদটা পেয়েছিল মীরা একদিন।

অরুণার দাদা সঞ্জয় তখন প্যারীতে।

হঠাৎ তার সঙ্গে সৌমিত্রর দেখা।

সে এসেছিল দু'দিনের জন্য নাকি ওই সময় প্যারীতে বেড়াতে।

সঞ্জয়ও সৌমিত্রকে চিনত।

কবে ফিরে এলো সৌমিত্র ইতালী থেকে।

আর তার স্বামীর সঙ্গে এ ভাবে যোগাযোগ ঘটলোই বা কি করে সৌমিত্রর।

তার স্বামী তো তাকে চেনে না—তার নাম পর্যন্ত শোনেনি, আর সৌমিত্রও সুভাষের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো সুযোগ পায়নি।

তবে—তবে এ ব্যাপারটা ঘটলো কি করে?

আর সৌমিত্র—

সৌমিত্র যখন দেখলো, যখন জানতে পারলো সে কোথায় এসেছে, কোন বাড়িতে সে ছবি আঁকার কাজ নিয়ে এসেছে—তারপরও সে কাজ করতে রাজী হলো কেন।

কেন সে আজ আবার এলো তার সামনে এমন করে এতকাল পরে।

কেন—

সৌমিত্রর মনে কি তবে কোনো মতলব আছে।

সেদিন তাকে তারা অপদস্থ করেছিল—অপমান করেছিল বলেই কি আজ সে প্রতিশোধ নিতে এসেছে তার ওপর এমনি করে।

প্রতিশোধ—নিশ্চয়ই তাই।

কিন্তু সৌমিত্র, কেমন করে তোমাকে আজ আমি বোঝাই, সেদিন তোমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর আমার উপায় ছিল না।

মনে মনে বারবার বলতে থাকে মীরা।

মীরা সেদিন ভেবেছিল—একদিন মীরাকে ভোলা হয়তো তার পক্ষে কষ্টকর বা দুঃসাধ্য হবে না কিন্তু কলকাতায় থাকলে তার পিতার চক্রান্তে সবকারের মিথ্যা আক্রোশে পড়ে জীবনটা হয়তো তার একেবারে নষ্ট হয়ে যেত।

কলকাতায় সে থাকলে অতবড় প্রতিভা একটা হীন জঘন্য চক্রান্তে শেষ হয়ে যেত একদিন।

হ্যাঁ, তার বাবা অশোক মিত্র সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন।

মেয়ে যখন স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিল অশোকনাথকে মুখের ওপর যে, সে সৌমিত্রকেই বিয়ে করবে, তখুনি সঙ্গে সঙ্গে অশোকনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

নিজের শোবার ঘরে অশোকনাথ পায়চারি করছিলেন।

সুভাষ বিলেত থেকে ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথাটা বলতেই মীরা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে—

কিন্তু তা তো সম্ভব নয় বাবা।

সম্ভব নয়, কেন ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকান মেয়ের মুখের দিকে অশোক মিত্র।

আমি—

বলো, থামলে কেন—স্পিক আউট—কি তোমার বলবার আছে।

সুভাষ ভৌমিককে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

আবার বলে মীরা।

পারবে না—

না।

কেন জানতে পারি কি?

অন্যের আমি বাগদত্তা—

কি বললে!

আর একজনকে আমি কথা দিয়েছি তাকে আমি বিয়ে করবো।

কে সে?

সৌমিত্র সেন।

বাট হু ইজ হি—লোকটা কে? কি তার পরিচয়, কি করে, কোথায় থাকে—

কালিঘাটের একটা মেসে থাকে, একজন নামকরা আর্টিস্ট—

হোয়াট—কি বললে!

চিত্রশিল্পী—আর্টিস্ট—

নিষ্ঠুর একটা ব্যঙ্গের হাসি যেন অশোকনাথের সমস্ত মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তার বাপ-মা—

কেউ নেই।

বাড়ি-ঘর পরিচয়ও নিশ্চয়ই কিছুই নেই বুঝতে পারছি—and you want to marry that vagabond—একটা রাস্তার ভিক্ষুক—

ড্যাডি—

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মেয়ের কাছে সে তাই—

তাহলেও তাকে আমি বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

শোন বেবী—

মীরাকে বেবী বলেই ডাকতেন অশোকনাথ, তার ডাক নাম।

বললেন, তুমি জানো সেন্টিমেণ্টের কোনো মূল্য আমার কাছে

নেই। তোমায় স্পষ্টই বলছি, যদি তুমি তাই অর্থাৎ ওই ডিসাইড করে থাকো—তবে জেনো, আমার সম্পত্তির এক কপর্দকও তুমি পাবে না।

দিও না, আমি চাই না।

চাও না—

না।

কথাটা বলে আর দাঁড়ায়নি মীরা বাপের সামনে।

সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু মীরা জানতো তার বাপকে।

জানতো এত সহজে অশোকনাথ সব কিছু মেনে নেবে না।

তাই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেও বাপের ঘরের দিকে কান পেতে ছিল।

একটু পরেই তার বাবার ঘরে তার মায়ের ডাক পড়লো, সুহাস—

॥ ৬ ॥

সুহাসিনী ধীরে ধীরে তার স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ান।

বুঝতে পারছি আগে থাকতেই তুমি সব জানতে—

স্পষ্টাস্পষ্টিই অশোকনাথ স্ত্রীকে বলে ওঠেন।

জানতাম—

শান্ত গলায় বলে সুহাসিনী।

তবে বলোনি কেন কথাটা একদিন আমাকে। মেয়েটা কোথাকার কে এক লোফারের সঙ্গে—

দেখ—মাথা ঠাণ্ডা করো। ছেলেটির পয়সা-কড়ি না থাকতে পারে কিন্তু ছেলেটি খারাপ নয় সেটা আমি জানি।

খারাপ নয় তুমি জানো।

হ্যাঁ।

সংক্ষেপে তখন সুহাসিনী সৌমিত্রর সমস্ত পরিচয় দেয়।

সে কি করে, কার ছেলে, কোথায় থাকে—সব।

আমাদের তো ওই একটিমাত্রই সন্তান—তা মেয়ে যখন ওকে ভালবাসে, তাই বলছিলাম—

ভালবাসে তাই না, কিন্তু ও ভালবাসা কর্পূরের মত উবে যাবে সুহাস—যেদিন নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের আর অভাবের মুখোমুখি ওকে দাঁড়াতে হবে। শোনো, অসীমকে এখুনি আমি ফোন করে দিচ্ছি, সে যা করবার করবে।

কি বলছো!

তাই, একটা পলিটিক্যাল কেসে জড়িয়ে যাবজ্জীবন যাতে শ্রীঘর বাস করতে হয় বাছাধনকে, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

না—না—

সুহাসিনী স্বামীকে বাধা দিয়ে বলে, ও কাজ করো না।

কিন্তু অশোকনাথ তখন যেন ক্ষেপে গিয়েছেন।

সোজা গিয়ে ঘরের কোণে টেলিফোনটা তুলে নিলেন—ডি-সি এ. কে. সেনকে দিন তো, আমি রায়বাহাদুর অশোক মিত্র কথা বলছি—

ওগো শোনো, থামো থামো—

সুহাস, বিরক্ত করো না, ঘরে যাও তোমার।

না, ওসব তোমাকে আমি করতে দেবো না।

সুহাসিনীর গলার স্বর শান্ত-দৃঢ়-কঠিন।

যে সুহাসিনী কোনোদিন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেনি আজ পর্যন্ত, সেই সুহাসিনীর দৃঢ় শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর যেন অশোকনাথকেও মুহূর্তের জন্য বিহ্বল করে।

অশোকনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান।

তাহলে তুমি চাও যে ওই একটা ভ্যাগাবণ্ড—রাস্তার একটা ভিক্ষুক, ওরই গলায় তোমার মেয়ে মালা দিক।

দেখ মেয়ে বড় হয়েছে, তার একটা নিজস্ব মতামত আছে।

মতামত—তার মানে নিশ্চয়ই পাগলামো নয়।

সে যা হবার হবে—এখনই কিছু হচ্ছে না, পরে ভেবে-চিন্তে—

বেশ, তবে তাই হবে।

অতঃপর কি যেন ভেবে অশোকনাথ ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

সুহাসিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অশোকনাথ প্রথমে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করলেন।

ফিরে এসে ফোনের রিসিভারটা পুনরায় তুলে নিলেন।

তারপর ডি-সি এ. কে. সেনকে যা বলবার ফোনে বলে দিলেন অশোকনাথ।

সুহাসিনী নিশ্চিন্ত থাকলেও মীরা কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি।

সে তার বাবাকে ভাল করেই চিনত।

সে বুঝতে পেরেছিল, অশোকনাথ এ বিয়ে কোনো মতেই ঘটতে দেবেন না।

তার একমাত্র সন্তানের চাইতেও তার কাছে তার ইজ্জত ও আভিজাত্যের মূল্য অনেক বেশি। এবং তার সেই আত্মাভিমানে এতটুকু আঁচড়ও তিনি সহ্য করবেন না।

মীরা স্থির থাকতে পারে না।

সৌমিত্রকে সাবধান করে দিতেই হবে এবং সে ব্যাপারে আর একটু দেরি করলেও চলবে না।

এখুনি এই মুহূর্তে।

টেবিলের ওপরে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকাল মীরা, রাত পৌনে এগারোটা।

অনেক রাত হয়েছে—

অশোকনাথের ঘরের আলো নিভে গিয়েছে।

তাহলেও তাকে আর একটু দেরি করতে হবে।

আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।

কিন্তু গাড়ি নিয়ে নয়—

পেছনের দরজা-পথে গলিতে বেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই বড় রাস্তা—একটা ট্যাক্সি কি আর পাওয়া যাবে না।

ট্যাক্সি একটা পাওয়া যাবেই।

কিন্তু কেবলমাত্র সৌমিত্রকে সাবধান করে দিলেই তো হবে না।

কথাটা হঠাৎ মীরার মনে হয়।

কলকাতা থেকে তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে হবে।

এখুনি—এই রাত্রেই।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে মীরা অন্ধকার ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

উঃ, সময় যেন আর কাটতে চায় না।

সময় যে এত দীর্ঘ, এত প্রলম্বিত হতে পারে এ যেন আজকের রাতের মত মীরা কখনো এমন করে আর মর্মে মর্মে অনুভব করেনি।

পাথরের মত ভারি হয়ে যেন সময় তার বুকের ওপর চেপে বসেছে।

তবু আশঙ্কার অবসান হয়।

বাইরের বারান্দার ওয়াল ক্লকটায় ঢং করে রাত্রি সাড়ে এগারোটা ঘোষিত হলো।

ওই শব্দটুকুর অপেক্ষাতেই যেন কান পেতেছিল মীরা এতক্ষণ।

কোনোমতে শালটা আলনা থেকে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে—ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে খুলে এক মুঠো নোট হাত ব্যাগটায় ভরে নিল মীরা।

নিঃশব্দে অতঃপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

সব অন্ধকার—

কেবল প্যাসেঞ্জের আলোটা আর সিঁড়ির মাথার আলোটা জ্বলছে।

ঘুমের নিঃসীম স্তব্ধতা সমস্ত বাড়িটায়।

তবু পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো মীরা।

পেছনের ডাইনিং হলের দরজা খুলে লনে এসে পড়লো বাড়ির পেছনে।

তারপর বাগান—

বাগানের পূবদিকে মালী ও মেথরদের যাতায়াতের একটা দরজা।

দরজাটা ভেতর থেকেই খিল দেওয়া থাকে—

খিল খুলে পেছনের গলিপথে এসে পড়ল মীরা।

সরু গলি—

আলো এত কম যে, একটা আলো-আঁধারির যেন সৃষ্টি করেছে।

হন হন করে হেঁটে চলে মীরা গলিপথ দিয়ে।

বড় রাস্তায় এসে পড়লো।

শীতের মধ্যরাত প্রায়।

রাস্তা একেবারে যেন নির্জন, খাঁ খাঁ করছে—

একটি জনমানব বা যানবাহন চোখে পড়ে না মীরার।

ট্যাক্সি।

কোথায় ট্যাক্সি—

কয়েক পা এগিয়ে গেল, যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়—কিন্তু কোথাও একটি ট্যাক্সি চোখে পড়ল না।

এখন উপায়—

আবার এগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ট্যাক্সির আশায় আশায় দেশপ্রিয় পার্ককে বাঁয়ে রেখে রাসবিহারী য়্যাভিনুর দিকে এগিয়ে চলে মীরা।

কিন্তু ট্যাক্সি কোথায়ও নেই।

যেতে হবেই সৌমিত্রর কাছে।

যেমন করে হোক আজ রাত্রেই।

অশোকনাথকে তার বিশ্বাস নেই।

আভিজাত্যে—ঐশ্বর্যের ব্যাপারে অশোকনাথ অতীব নিষ্ঠুর।

পায়ে হেঁটেই চলল মীরা।

হন হন করে হেঁটে চলে।

॥ ৭ ॥

সৌমিত্র বলেছিল, তা হোক, একা তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না—এই রাত্রে এমন করে।

কিছু হবে না। কতটুকুই বা পথ—ও আমি একাই চলে যেতে পারবো। তুমি ভেবো না কিছু।

কথাটা বলে মীরা আর সৌমিত্রর উত্তরের অপেক্ষা করেনি।

হন হন করে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সব কথাই আজ মনে পড়ছে সৌমিত্রর।

অত রাত্রে একটা ট্যাক্সিও পায়নি। যানবাহন অন্যান্য সব কিছু তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হাঁটা ছাড়া আর পথ ছিল না।

হাঁটতে হাঁটতেই তাই শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছিল সৌমিত্র এক সময় সে রাত্রে।

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

পূর্বাশার প্রান্তে একটা রক্তিম ছোপ লাগছে।

বড্ড ক্লান্ত লাগছিল।

একটা প্লাটফরমের টিকিট কেটে প্লাটফরমের মধ্যে ঢুকে একটা বেঞ্চের ওপর বসে সৌমিত্র।

এত সকালে কোনো ট্রেন নেই।

দু'চোখের পাতা ঘুমে যেন জড়িয়ে আসছে।

প্লাটফরমের সেই বেঞ্চের ওপর গায়ের আলোয়ানটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সৌমিত্র।

একটু ঘুমিয়ে নিলে ক্ষতি কি—

ঘুমিয়ে পড়েছিল সৌমিত্র।

বেলা প্রায় আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙল।

স্টেশন তখন যাত্রীদের ভিড়ে আবার সরগরম হয়ে উঠেছে।

এদিক থেকে ওদিক থেকে ট্রেন আসছে—যাচ্ছে—থামছে।

যাত্রীদের ওঠানামা—কুলিদের চিৎকার—

প্রথমটায় ঠিক যেন কিছু মনে পড়েনি সৌমিত্রর।

তারপরই আস্তে আস্তে বুঝি মনে পড়েছিল সব কথা।

রাত্রে কালিঘাটের সেই মেসের ঘরে ছবি আঁকছিল, হঠাৎ মীরা এসে উপস্থিত।

মীরা—

মীরা তাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে বলেছে।

বললো না মীরা কিছুতেই, তাকে কাল রাত্রে এত তাড়াহুড়া করে কেন ওই রাত্রেই তাকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে—

তা না বলুক, তাকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে মীরা বলেছে যখন—তখন সেই তার কাছে যথেষ্ট।

উঠে পড়লো সৌমিত্র।

এবং সেইদিনই তুফান এক্সপ্রেসে সৌমিত্র কলকাতা ছেড়েছিল।

কোথায় যায়, কোথায় আপাতত যায়—ভাবতে ভাবতে বন্ধু বিভূতি ও বান্ধবী সর্বাণীর কথা মনে পড়লো।

আগ্রায় তারা থাকে অনেক দিন থেকে।

দুজনেই অধ্যাপনা করে।

আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সেতার বাজায়।

আগ্রায় গেল সৌমিত্র।

জানতো, বিভূতিদের বাড়ি ছিপিটোলায়।

একটা টাঙ্গা নিয়ে সৌমিত্র ছিপিটোলায় খুঁজতে খুঁজতে ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

বিভূতি ওখানে 'মাস্টার সাব' বলে পরিচিত।

বিভূতি তো ওকে দেখে অবাক।

কি ব্যাপার রে, পথ ভুলে নাকি?

সর্বাণীও তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়।

অনেককাল পরে দেখা।

সর্বাণী বেশ মুটিয়েছে।

গোলগাল চেহারাটা হয়েছে।

রংটা সর্বাণীর চিরদিনই ফর্সা—বয়েসের সঙ্গে যেন আরো একটু ফর্সা হয়েছে।

এক ছেলে এক মেয়ে।

নিঝ্ঞ্ঝাট সংসার।

সর্বাণী তখন সবে স্নান সেরে চা তৈরি করে চা ছাঁকছিল।

বিভূতি বলে, দেখ সর্বাণী, কে এসেছে।

সৌমিত্রবাবু যে?

সৌমিত্রর বাবা যখন কৃষ্ণনগরে ছিল, সেই সময় সর্বাণীরা তাদের পাশের বাড়িতে থাকতো।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সর্বাণী—

বিভূতি তাকে সেতার বাজানো শেখাতো।

বিভু ওদের বাড়ি বালুরঘাটে।

পুরোহিত ছিলেন ওর বাবা।

বিভূতি ম্যাট্রিক পাস করে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিল।

ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়েছিল কৃষ্ণনগরে।

আদালতে একটা সামান্য চাকরি জুটিয়ে নেয়।

ভাল সেতার বাজাতে পারত বিভূতি।

দু' চারটে টিউশানী জোগাড় করে নেয় সেতারের।

সর্বাণীর বাবাও তাকে নিজের মেয়ের সেতার বাজানো শেখাবার জন্য নিযুক্ত করেন—

সেই দুজনের আলাপ।

তারপর একদিন সর্বাণীর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন।

বিভূতি সর্বাণীকে বিয়ে করলো।

বিয়ের পরও বিভূতি কৃষ্ণনগরে কিছুদিন ছিল, তারপর কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে আসে আগ্রায় এক সময়।

সেও আজ বছর দশেকের বেশি হবে।

মধ্যে মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে চিঠি দিত।

সেই চিঠিতেই জানতে পেরেছিল—দুজনেই তারপর ক্রমশ পড়াশোনা করে এম-এ পাস করে।

সর্বাণী স্থানীয় গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়েছে আর বিভূতি স্থানীয় এক কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছে।

সুখের আনন্দের ছোট্ট সংসার।

সর্বাণী শুধোয়, তারপর এদিকে—কি ব্যাপার?

সৌমিত্র হাসে, কেন আগ্রায় আসতে নেই নাকি?

তা আসবে না কেন—বেড়াতে বুঝি?

তাই।

তা এ সময়, এই প্রচণ্ড শীতে—এ সময় তো এখানে বড় একটা কেউ আসে না—

বিভূতি বলে, খুব শীত মনে হচ্ছে না—

না তো।

সর্বাণী বলে, বলেন কি—আপনারা তো বাংলা দেশের লোক, এখানে বাংলা দেশের চাইতে অনেক বেশি শীত।

আমার তো বেশ আরামই লাগছে।

সর্বাণী চা ও জলখাবার নিয়ে এলো।

চা ও জলখাবার দিয়ে সর্বাণী রান্নাঘরে চলে গেল।

বিভূতি গল্প করে।

সত্যিকথা বলতে কি—বিভূতি যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়েছিল সৌমিত্রর দিকে তাকিয়ে।

মুখে ছোট ছোট দাড়ি।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো।

পরনের কাপড়-জামা ও আলোয়ানটা ময়লা।

পায়ে একটা স্যাণ্ডেল মাত্র—সঙ্গে একটা সুটকেশ পর্যন্ত নেই।

মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে সৌমিত্র।

সৌমিত্র আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, বিভূতি একটা সিগ্রেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় সৌমিত্রর দিকে।

সৌমিত্র একটা সিগ্রেট নিয়ে ধরায়।

আঃ, বাঁচা গেল। একটা কথা বিভূতি—

সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সৌমিত্র বলে।

কি—

আমি কিন্তু তোদের এখানে ক'টা দিন থাকবো ভাই।

সানন্দে—

বিভূতি মৃদু হেসে বলে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই কি বল্ তো।

ব্যাপার—

হ্যাঁ—মনে হচ্ছে যেন অকস্মাৎ এককাপড়ে গৃহত্যাগ করে এসেছিস।

ঠিকই ধরেছিস। কতকটা তাই হয়ে গিয়েছে।

তার মানে—

তাছাড়া কি। হঠাৎ এসে মাঝরাত্রে এমন তাগাদা দিলে—

তাগাদা দিলো—

হুঁ।

কে?

কে আবার—

তারপরই হঠাৎ থেমে বলে সৌমিত্র, তোরা তো তবু বিয়ে-থা করে বেরিযে এসেছিস একদিন সবার সামনে দিয়ে, আর দেখ না আমি—কেউ কিছু জানলো না কিছু না—মাঝরাত্রে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়লাম।

কথাগুলো বলে হাসতে থাকে সৌমিত্র।

রীতিমত কৌতুকের যেন আগাগোড়া ব্যাপারটা।

দে, আর একটা সিগ্রেট দে দেখি—

সৌমিত্র তার নিঃশেষিত সিগ্রেটটা শূন্য চায়ের কাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে পুনরায় হাত বাড়ায় বিভূতির দিকে।

প্যাকেট ও দেশালাইটা সৌমিত্রর দিকে এগিয়ে দেয় বিভূতি।

সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে সৌমিত্র বলে, সত্যি দাড়িটা মুখে কুট কুট করছে, একটা নাপিতও পাওয়া যায় না—ধারে কাছে তোদের এখানে কোনো সেলুন নেই—

আছে—আমার ক্ষুর সাবানও তো আছে, কামিয়ে নিবি নিজে।

তবে তো ভালই হয়। দে—

বিভূতি সব কিছু এনে সৌমিত্রর সামনে রাখে।

দাড়ি কামানো হয়ে গেলে বলে সৌমিত্র, একটা ধুতি দে, স্নান করে নিই। দু'দিন দু'রাত স্নান নেই—[illegible] স্নান করা অভ্যেস, একেবারে যেন জ্বলেই গিয়েছিলাম—বাথরুমটা তোদের কোথায়?

বিভূতি আর কোনো কথা বলে [illegible] ব্যবস্থা করে [illegible] সৌমিত্রর স্নানের।

অনেকক্ষণ ধরে ওই শীতের সকালেও ঠাণ্ডা জলে স্নান করলো সৌমিত্র।

সর্বাণী আবার এক প্রস্থ চা নিয়ে এলো।

চা খাওয়া হয়ে গেলে বিভূতি বললে, এবার সত্যি কথাটা খুলে বল তো সৌমিত্র।

সত্যি কথাটা আবার কি?

সৌমিত্র বিভূতির মুখের দিকে তাকায়।

তোর ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার—

হ্যাঁ—এভাবে কোনো সংবাদ পর্যন্ত না দিয়ে একেবারে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়েছিস অনির্দিষ্টভাবে।

অনির্দিষ্টভাবে—

নয়তো কি? নিশ্চয়ই তুই আগ্রায় আসবো বলে আসিস নি।

তবে?

কৌতুকের সঙ্গে সৌমিত্র বিভূতির মুখের দিকে তাকায়।

হঠাৎ চলে এসেছিস।

কতকটা তাই রে বিভূতি—

মানে?

মানে মীরা এসে বললে মাঝরাত্রে, এখুনি বেরিয়ে পড়ো—বেরিয়ে পড়লাম।

মীরা—

বিস্ময়ে প্রশ্ন করে বিভূতি।

হ্যাঁ। মীরা এমনি মেয়ে যে কি বলবো। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই—মাঝরাত্রে এসে হাজির। ওরই অনুরোধে রাত জেগে ঘরের মধ্যে একজিবিশনের ছবিগুলোয় টাচ দিচ্ছিলাম, এসে ঝড়ের মত হাজির। কি সংবাদ না—এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথায়—জানি না, যেখানে হোক। যত বলি কেন, তা ওই এক কথা—বেরিয়ে পড়ো।

এমন কি জামা-কাপড় স্যুটকেশটা নেওয়ারও সময় দিলে না—ঠেলে যেন ঘর থেকে রাস্তায় বের করে দিলো।

কথাগুলো একটানা বলে হাসতে থাকে সৌমিত্র।

বিভূতি চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

বলে, তা মীরাটি কে?

মীরা—

হ্যাঁ—কে সে?

বলিনি তোকে তার কথা? ওই তো সেই মীরা—যার কথা নিশ্চয়ই তোকে চিঠিতে লিখেছি।

না। কোনোদিন—কখনো লিখিসনি।

লিখিনি?

না।

বলিস কি! আমার তো মনে পড়ছে লিখেছি তোকে চিঠিতে।

না। যে ভোলা মন তোর, হয়তো লিখবি ভেবেছিস—তারপর আর লেখার কথা তোর মনেও হয়নি।

কিন্তু—

তাছাড়া বছর তিনেক তো তুই আমাকে কোনো চিঠিই দিসনি।

তিন বছর চিঠি দিইনি তোকে?

না।

॥ ৮ ॥

সৌমিত্র যেন হঠাৎ চুপ করে গেল।

তারপর একসময় মৃদুকণ্ঠে কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলে, আশ্চর্য! লিখিনি তোকে—মীরার কথা তোকে লিখিনি! তা হবে হয়তো। জানিস বিভূতি—

কি।

মীরা—মানে মীরাকে আমি বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

তাই নাকি ?

হুঁ—সে তো এখানেই আসবে।

এখানেই।

সৌমিত্রর দিকে তাকিয়ে থাকে বিভূতি।

হ্যাঁ। আমি আগে চলে এসেছি—আজই তাকে একটা চিঠি দিতে হবে তোর এখানকার ঠিকানা দিয়ে। আশ্চর্য, তখন যদি মনে পড়তো একবারও তোর কথাটা, ঠিকানাটা এখানকার তোর একেবারে দিয়েই আসতাম ওকে।

কিন্তু সৌমিত্র—

বিভূতি বাধা দেয়, মীরা কে তাই এখনো বললি না। কার মেয়ে, কোথায় থাকে—

সৌমিত্র হেসে ফেলে।

বলে, ওরে বাবা, তুই যে একেবারে কোর্টের জেরা শুরু করে দিলি।

তা সে কে বলবি তো।

মীরার সঙ্গে আমার আলাপ কলকাতায়। আমার আঁকা ছবিগুলোর একটা শো দিয়েছিলাম—

হুঁ, তা—

সেইখানে—

রোমান্টিক বলে মনে হচ্ছে।

না রে না, সে রকম কিছু নয়।

তবে ?

মীরা এসেছিল তার কলেজের কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে আমার আঁকা ছবিগুলো দেখতে—তার একটা ছবি ভাল লাগায় কিনতে চায়, তারপর আমার ঠিকানাটা সংগ্রহ করে আমার মেসে আসে।

তারপর ?

তারপর আবার কি—ক্রমে ভাব হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য জানিস।

কি?

প্রথমটায় দুজনে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল।

তাই বুঝি!

হুঁ। এসেই বলে, কত দাম আপনার ছবিটার—

বলতে বলতে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা খোলে।

একরাশ নোট ব্যাগটার মধ্যে।

চট করে আমার মাথায় ভুত চেপে গেল, বললাম, আপনি দেখছি একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

কত দিতে হবে ছবিটার দাম বলুন।

তা আমি বিক্রি করবোই ছবিটা—এত সিওর হলেন কি করে?

সিওর হবার এর মধ্যে কি আছে। আপনারা আর্টিস্টরা তো ওইজন্যই আপনাদের আঁকা ছবির শো দিয়ে থাকেন।

তাই বুঝি—

হ্যাঁ। এখন বলুন—How much you expect—

টাকায় ও ছবি কেনা যায় না।

আমাব নাম মীরা মিত্র—অশোক স্টিল ইণ্ডাস্ট্রিজের নাম নিশ্চয় শুনেছেন—রায়বাহাত্বর অশোকনাথ মিত্রের মেয়ে আমি।

হঠাৎ হেসে ফেলে সৌমিত্র।

তাবপর শান্তগলায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, না।

শোনেন নি আপনি নামটা?

না। ওই নামটা শোনবার বা জানবার সৌভাগ্য কোনোটাই আমার হয়নি, আর হবেও না প্রয়োজন কোনোদিন আশা করি।

মীরা যেন হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেল।

এমন একটা কথা কোনোদিন শুনতে হবে—তার বাবা রায়-বাহাত্বর অশোকনাথের নাম শোনেনি আজকের দিনে—

অতবড় একজন ধনী বিজনেস ম্যাগনেট—এ যেন তার কল্পনারও অতীত ছিল।

বুঝতে পারে না অতঃপর কি বলবে।

কয়েকটা মুহূর্ত তাই বোধহয় চুপ করেই থাকে।

তারপর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া গলায় বলে, ছবিটা বিক্রি করবেন না?

বললাম তো একটু আগে আপনাকে—না।

কিন্তু কেন!

কেন কি—আমার ছবি আমি বিক্রি করবো না।

বাঃ, বিক্রি করবেন না অমনি বললেই হলো। তবে শোর ব্যবস্থা করেছিলেন কেন আর নিচে লেখাই বা ছিল কেন 'ফর সেল'—

হ্যাঁ তা লেখা ছিল।

তবে—

এখন স্থির করলাম বিক্রি করবো না।

তাব মানে?

তার মানে আবার কি! বিক্রি করবো না।

সত্যিই করবেন না?

না।

আশ্চর্য!

কি—

আপনি দেখছি ভীষণ খেয়ালী—

খেয়ালী!

নয়?

একটু থেমে আবার বলে মীরা, খেয়ালী মতলবী—মনের পর্যন্ত স্থিরতা নেই আপনার।

কি বললেন!

কিছু না। মিথ্যা কেবল আমাকে দৌড় করালেন।

সেজন্য আমি দুঃখিত মীরা দেবী—

ওই ফরম্যালিটির কোনো মানেই হয় না। ছবিটা সত্যিই আমার ভাল লেগেছিল বলে আপনার ঠিকানা জোগাড় করে—

ছবিটা আপনার ভাল লেগেছিল!

না হলে আসবো কেন কিনতে। অবিশ্যি যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন ভাল লেগেছিল—তাহলে বোকার মতই হয়তো আপনার মুখের দিকে বোবা হয়ে চেয়ে থাকবো, কারণ আর্টের 'অ'-ও আমি বুঝি না—

বোঝেন না!

না—

হেসে ফেলে মীরা।

তবে—

ভাবছেন—কেন তবে কিনতে এসেছি, এই তো? তা এসেছি—আর আপনি বেচলে যা চাইতেন তাই দিয়েই নিয়েও যেতাম।

তারপর—

কি তারপর?

কি করতেন ছবিটা কিনে?

কি করতাম মানে?

বড়লোক আপনারা—অনেক টাকা আপনাদের, হয়তো কিনে নিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোণে ফেলে রাখতেন, তাই না?

না মশায়, অতশত ভাবলাম কখন? কিন্তু প্রথম থেকেই আপনি যে ভাবে চটে চটে কথা বলছেন, হয়তো আরো কিছুক্ষণ থাকলে আমার গালে একটা চড়ই বসিয়ে দেবেন। চলি, নমস্কার—সরি টু ট্রাবল ইউ।

মীরা যাবার জন্য পা বাড়ায়।

দাঁড়ান, শুনুন—

কি ব্যাপার?

মীরা যেন বিস্ময়েই ফিরে দাঁড়ায়।

চলে যাচ্ছেন ?

তা আর কি করবো।

ছবিটা নিতে এসেছিলেন যে ?

এসেছিলাম, কিন্তু আপনি বেচলেন কোথায় ?

বেচবো না, তবে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি দাঁড়ান—ছবিটা আপনি চিঠিটা দিয়ে নিয়ে যাবেন।

এমনি—মানে কোনো মূল্য না দিয়ে ?

হ্যাঁ।

উহুঁ—

কেন ?

না—তা নেবো কেন ? একজনের পরিশ্রমেব ওপর জবরদস্তি করবো কেন ? ও আমি করি না—

জবরদস্তি তো নয়—আমিই তো স্বেচ্ছায় দিচ্ছি।

না, তাই বা দেবেন কেন আমাকে। আর আমিই বা তা নেবো কেন—আমার সঙ্গে আপনাব পরিচয় কতটুকু—

কেন, এইতো পরিচয় হলো—

মীবা হেসে ফেলে।

বলে, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি—আচ্ছা চলি, ধন্যবাদ।

মীরা আর দাঁড়ালো না, চলে গেল।

তারপর—

বিভূতি জিজ্ঞাসা করলে।

আমি গিয়ে পরের দিন ছবিটা মীরার ঠিকানা সংগ্রহ করে তার নামে পাঠিয়ে দিলাম।

সে নিলে ?

হ্যাঁ—তবে পরের দিন ছু' হাজার টাকার একটা চেক আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

চেক!

হ্যাঁ—সঙ্গে একটা চিরকুট : সামান্য প্রণামী পাঠালাম, গ্রহণ করবেন আশা করি। মূল্য নয় কিন্তু, প্রণামী—

তুই কি করলি?

নিলাম।

নিলি?

হ্যাঁ, তবে পরে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।...যাক, যা বলছিলাম শোন—ভুলেই গিয়েছিলাম মীরার কথা এবং চেকটার কথাও। চেকটা ড্রয়ারের মধ্যে পড়েই ছিল—

মাসখানেক বাদে এক সন্ধ্যায় মীরা এসে আমার মেসে হঠাৎ হাজির। তার হাতে আমার সেই ছবিটা।

নমস্কার। চিনতে পারছেন।

হ্যাঁ, নমস্কার—আপনি মীরা দেবী।

আমার নামটা তাহলে মনে আছে।

মনে আমার থাকে। চট করে ভুলি না।

তাই দেখতে পাচ্ছি। এই নিন—

হাতের প্যাকেটটা মীরা এগিয়ে দিল।

কি এটা?

আপনার সেই ছবিটা—

ছবি!

হ্যাঁ—যেটা আমায় আপনি দান করেছিলেন।

দান—

আর শুনুন—আমার জীবনে কখনো দান আমি নিই না কারো কাছ থেকে—সেদিনই তো আমি বলেছিলাম আপনাকে। তাই সেই দানের বস্তুটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি—এই রইলো আপনার ছবি।

ছবিটা বাঁধিয়ে আমার শোবার ঘরে চোখের সামনে টাঙিয়ে রেখে-ছিলাম।

বড্ডো রেগে গিয়েছেন দেখছি।

বাঃ, রাগতে যাবো কেন! এর মধ্যে রাগারাগিব কি আছে—

রেগেছেন, নচেৎ ওকথা বলছেন কি করে! আপনিও তো মোটা টাকার একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং আমি যখন সেটা গ্রহণ করেছি, তখন আর ওটা দান হয় কি করে।

মিথ্যেকথা বলবেন না।

তার মানে—

নয়তো কি—টাকা আপনি নিয়েছেন বলতে চান?

নিশ্চয়ই।

ক্যাশ করেছেন?

ক্যাশ!

হ্যাঁ—

না—করেন নি।

বোধহয় করেছি—হুঁ—একটা চেক যেন ভাঙিয়েছিলাম মনে পড়ছে—

কই, তাহলে দেখি আপনার ব্যাঙ্কের পাশ-বই বা স্টেটমেণ্ট অফ একাউণ্টটা—

সেসব তো আমার নেই।

তার মানে!

ব্যাঙ্ক একাউণ্টই তো আমার নেই—

তবে—

কি তবে?

ভাঙালেন কি করে চেকটা। ক্রশ করা চেক—আপনি নিশ্চয়ই ভাঙান নি কিংবা হারিয়ে ফেলেছেন চেকটা।

না, দাঁড়ান দেখি—

ড্রয়ার খুঁজতেই চেকটা বেরিয়ে পড়লো কাগজপত্রের মধ্যে।

ইস—সত্যিই দেখছি ভাঙানো হয়নি—মানে ক্যাশ করা হয়নি। এই যে চেক—

দেখি—

সত্যি সেটাই মীরার পাঠানো চেক।

চেকটা আমি নিয়ে যাচ্ছি—

আর ছবিটা—

ওটাও নেবো, কারণ ওটা আমার ভীষণ পছন্দ। কাল নগদ টাকা পাঠিয়ে দেবো—চলি, নমস্কার।

একটু দাঁড়ান না মীরা দেবী—

মীরা ঘুরে দাঁড়ালো।

কিছু বলছিলেন ?

হ্যাঁ। ছবিটা কি এমনি—মানে কারো প্রীতির নিদর্শন হিসেবেও গ্রহণ করতে পারেন না আপনি। মনে করুন না আমাদের আলাপের স্মারক-চিহ্ন স্বরূপ আমার আঁকা একটা ছবি আপনার শোবার ঘরে টাঙানো রইলো। আজ তো আর আপনি বলতে পারবেন না—আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনি না। দু-দুবার আমাদের দেখা হলো, কথাবার্তা হলো। শাস্ত্রে বলে—কোনো রকম কথা না বলেও যদি দশ পা একত্রে যাওয়া যায় তো বন্ধুত্ব হয়ে যায়—

অতএব আপনি মনে করেন—আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে।

অবিশ্যি আপনি যদি অস্বীকার করেন—

না।

অস্বীকার করছেন কিন্তু এখনো।

না—স্বীকার করে নিলাম।

সত্যি ?

সত্যি।

তবে যাবেন না, বসুন—এক কাপ চা আনাই।

কি ?

মীরা দেবীর পিতৃদেবটি ওই রায়বাহাদুর না কি—ও নেপথ্যেই রয়ে গেলেন। তাঁর কথা তো কিছু বললি না।

তাঁকে চিনলাম কবে যে তাঁর কথা তোকে বলবো।

সে কি রে—মেয়ের বাপের সঙ্গে কোনো পরিচয় হয়নি ?

না।

তবে—

কি তবে ?

॥ ৯ ॥

কি করে কি হবে ?

বিভূতিকে যেন একটু চিন্তিতই মনে হয়।

বিভূতি, তুই যেন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লি—

সৌমিত্র বলে।

তা হয়েছি—

কেন রে !

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। যুগের হাওয়ায় যতই আমাদের মনটা এগিয়ে যাক না কেন, আমাদের সমাজ পিতা ও কন্যার সম্পর্কটা এবং তাদের মধ্যে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং যে এখনো আছে রে—

কথাটা শুনে সৌমিত্রর মনেও যে ওই মুহূর্তে একটু খটকা লাগে না তা নয়।

সত্যিই তো—

অশোক স্টিল ইণ্ডাস্ট্রিজের ডাইরেক্টার রায়বাহাদুর অশোক মিত্রের সঙ্গে তো এখনো তার চাক্ষুষ পরিচয়টাও হয়নি।

তাঁর মেয়ে মীরা মিত্রকেই সে জানে।

মীরার সঙ্গেই তার যা কিছু আলাপ।

আশ্চর্য।

মীরার বাবা রায়বাহাদুর অশোকনাথ মিত্রের কথাটা আজ পর্যন্ত কখনো তার মনেও হয়নি কেন।

কেন মনে হয়নি।

তবে কি সে ভেবেছিল মীবাকে বিয়ে কবতে হলে তার বাবার কোনো প্রয়োজন হবে না।

সত্যিই তো।

এ কথাটা সে কেমন কবে ভাবলো।

মীরাকেও সে ওই কথাটা কখনো জিজ্ঞাসা করেনি।

মীরাও কোনোদিন কোনো প্রসঙ্গে কখনো তার বাবার কথা উত্থাপন কবেনি।

অথচ তাব মনে হয়েছে মীরার বাবার কাছে তাকে একদিন নিশ্চয়ই যেতে হবে।

গিয়ে কি বলবে তাও যে না ভেবেছে তা নয়।

ভেবেছে গিয়ে বলবে—আমি সৌমিত্র, মীবাকে আমি ভালবাসি—সেও আমাকে ভালবাসে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করতে চাই।

তুমি সৌমিত্র—

রায়বাহাদুর অশোকনাথ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন তখন।

আজ্ঞে সৌমিত্র সেন।

কি করা হয়?

আমি একজন আর্টিস্ট—

তার সঙ্গেও আমার একবার কথা বলার দরকার। ইয়ং ম্যান—তারপরই হয়তো তিনি মীরাকে ডাকবেন।

মীরা—মীরা—

মীরা অতঃপর সামনে এসে দাঁড়াবে, বাপী, তুমি কি আমায় ডাকছিলে ?

হুঁ—সৌমিত্র কি বলছে ? হি লাভস ইউ।

মীরা মাথা নিচু করবে।

রাযবাহাদুরের তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে কোনো আর কষ্ট হবে না।

ব্যাপারটা ঠিক বরাবর এমনি সহজই মনে হয়েছে সৌমিত্রর। সে মীরাকে ভালবেসেছে—তাকে সে বিয়ে করবে তাতে কোথায়ই বা এত হাঙ্গামা ?

সৌমি—

উ—

হঠাৎ যেন সৌমিত্রর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায় বিভূতির ডাকে।

তুই যা ভাবছিস তা হতে পারবে না।

কি ?

অত সহজে বিয়েটা হতে পারবে না বলেই আমার মনে হয়।

কেন ?

ভুলে যাচ্ছিস কেন! জাতের কথা ছেড়ে দিলেও সামাজিক আভিজাত্যের ও সম্পদের দিক দিয়ে তোর ও মীরার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক।

ফারাক ?

নয় ? ভেবে দেখ তুই একজন আর্টিস্ট, কি তোর পরিচয় আছে আজকের সমাজে—বিশেষ করে মীরাদের পরিচিত সমাজে। কলকাতায় বা কোথায়ও একটা বাড়ি নেই, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই, ছুটো গাড়ি নেই, নেই [illegible] একটা চোখে পড়ার মত স্বীকৃতি—

কিন্তু—

আর মীরার কথা ভেবে দেখ। অশোক স্টিল ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের একমাত্র দুহিতা—বিরাট ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, বিরাট বাড়ি, চার-পাঁচটা গাড়ি—

তাতে কি—

ওরে নির্বোধ, তাতে অনেক কিছু। তোদের দুজনের গোত্রই যে আলাদা।

গোত্র আলাদা বলছিস!

হুঁ।

না রে, তুই মীরাকে জানিস না। সে যে কি ভালবাসে আমাকে, যদি জানতিস বিভূতি—

প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সৌমিত্র।

জানবার দরকার নেই সৌমিত্র, ও ধরনের ভালবাসার কথা অনেক শুনেছি—অনেক দেখেছি। মীরা তার বাপের ওই বিরাট ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছল্য ছেড়ে তোর গলায় মালা দিলেও জানবি সে মালা দুদিনেই শুকিয়ে যাবে—যদি না তার পেছনে রায়বাহাদুরের স্বীকৃতি থাকে একটা সত্যিকারের। তার চাইতে আমি বলি বরং—

কি!

শুধু মীরাকে নয়, মীরার বাবাকেও তুই একটা চিঠি লেখ।

চিঠি?

হ্যাঁ—আজই তুই লিখে দে তোদের বিয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে।

বেশ, লিখবো। তবে তুই দেখে নিস, মীরার বাবা তার মেয়েকে যত ভালবাসে, শুনেছি তো তার মুখে কতবার—তার বাবা নিশ্চয়ই স্বীকৃতি দেবে।

খুব ভাল [illegible] এ বিয়ে অসবর্ণ বিয়ে হবে না।

কিন্তু তার আগে যে আমার কিছু জামা-কাপড় দরকার—একবার বাজার যেতে হবে।

বেশ তো, চল!

কিন্তু সৌমিত্র জানতো না—

ইতিমধ্যে সাউথ ক্যালকাটার ডি-সি মিঃ সেন তার বন্ধু রায়বাহাদুরের নির্দেশ শুনে যা ব্যবস্থা করার করেছিলেন।

রাতারাতিই ব্যবস্থা করেছিলেন।

এবং শেষ রাত্রের দিকে দু'জন পুলিশ অফিসার যখন সৌমিত্রর মেসে এসে হানা দিল মেসের সকলকে প্রায় জাগিয়ে তুলে—সৌমিত্র তখন নেই।

তার ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে একটা।

ব্যাপারটা মীরা জেনেছিল পরের দিনই—

মীরা কান পেতেই ছিল।

কারণ সে জানতো—তার বাবা অশোকনাথ মার কথায় আপাতত টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেও সৌমিত্রকে সে নিষ্কৃতি দেবে না।

তাই সে যেমন ওই রাত্রেই সৌমিত্রর মেসে ছুটে গিয়েছিল, তেমনি সৌমিত্রকে মেস থেকে সরিয়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে বাপের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল।

এবং তার অনুমান বা সন্দেহ যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণ হতে দেরিও হলো না।

বেলা পৌনে আটটা নাগাদ ডি-সি'র গাড়িটা তাদের বাড়ির গেট দিয়ে এসে ভেতরে প্রবেশ করলো।

অসীমকাকা এ গৃহে অপরিচিত নন, অশোকনাথের একজন পারিবারিক বন্ধু ও হিতৈষী হিসাবে।

তিনি সোজা উপরে চলে এসে অশোকনাথের ঘরে ঢুকলেন।

বাইরের বারান্দায় কান পেতে থাকে মীরা।

বারান্দায় কিছু পামটি গাছ টবে সাজানো আছে, তারই আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে মীরা।

কি খবর অসীম ?

অশোকনাথ প্রশ্ন করেন ব্যাকুল দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে।

ছেলেটা তো পালিয়েছে—

মৃদু হেসে বলেন অসীম।

পালিয়েছে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

ঘরের দরজায় তালা দেওয়া—অবিশ্যি তা হলেও আমি সেখানে সর্বক্ষণ ওয়াচ করবার জন্য লোক রেখে এসেছি।

কিন্তু সে পালাবে কেমন করে ! সত্যি কথা ?

তাই মনে হচ্ছে—কারণ মেসের ম্যানেজারের দরজার গোড়ায় একটা চিঠি পাওয়া গেছে।

চিঠি !

হ্যাঁ, এই দেখ না—

চিঠিটা যদিও সৌমিত্রর জবানীতে লেখা, হস্তাক্ষর চিনতে কিন্তু এতটুকুও দেরি হয় না অশোকনাথের।

অশোকনাথ যেন বোবা হয়ে যান।

তার মেয়ে মীরার হস্তাক্ষর।

চিঠিতে লেখা :

ম্যানেজারবাবু, আমি একটা বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি আজই রাত্রে, কবে ফিরবো জানি না—তবে ভাড়ার জন্য ভাববেন না। মাসের প্রথমে নিয়মিত টাকা পাবেন।

কি হলো, চিঠিটা পড়লে ?

হ্যাঁ—

চিঠিটা পড়েই মনে হচ্ছে সে ভেগেছে এবং—

অশোকনাথ অসীমের মুখের দিকে তাকালেন।

কিন্তু—মনে হচ্ছে ও পূর্বাহ্ণ নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল—but how—কেমন করে—

পুনরায় প্রশ্ন করে অসীম।

রেবী তাকে সাবধান করে দিয়েছে—

চিঠিটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই শান্তকণ্ঠে বলল অশোকনাথ।

অসীম কথাটা শুনে যেন রীতিমত বিস্মিত।

বলে, কি বলছো হে!

তাই।

তোমার মেয়ে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

অসীমের মনের মধ্যে যেন কোথায় একটা সংশয়।

অশোকনাথ পুনরায় শান্তকণ্ঠে বলল, এ চিঠি রেবীরই হাতের লেখা।

তুমি কি তাকে কিছু বলেছিলে নাকি ?

প্রশ্নটা করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন অসীম।

না। তবে সে বুঝতে পেরেছিল মনে হচ্ছে—সন্দেহ করেছিল।

দেখ অশোক—

বলো।

একটা কথা বলবো কিছু যদি না মনে করো—

কি ?

মেয়ে তোমার বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে—তাই বলছিলাম সে যখন ছেলেটিকে মনে মনে ভালই বাসে—

শান্ত কঠিনকণ্ঠে বন্ধুকে একপ্রকার থামিয়ে দিয়েই বলে ওঠে, না।

কেন নয় অশোক?

সে তুমি বুঝবে না অসীম।

কেন বুঝবো না। বলো, কি বলতে চাও।

দেখ, অভাব আর দারিদ্র্য এমন জিনিস যে প্রাচুর্য দিয়েও তার দাগ মুছে ফেলা যায় না। সেজন্য আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, আমি ভাবছি—

কি।

কেবল যে এতটা এগিয়ে গিয়েছে ভাবতে পারিনি। আমি স্ব[illegible] অ[illegible] ছিল আমার।

তা হলেও বলবো অশোক, তুমি তা [illegible] দেখাতে পারবে।

ভাবনা। এর মধ্যে কিছু নেই অসীম, সুভাষ এসে গেছে বিলেত থেকে।

সুভাষ—

হ্যাঁ।

কে বলো তো।

মনে নেই তোমার? যতীনের ছেলে—আমি তাকে বিলেতে পাঠিয়েছিলাম।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

আমি যতীনকে বলবো বিয়েটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে—

অসীম আর কোনো কথা বলেন না—

কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে থাকেন।

তোমার কিন্তু ছেলেটার ওপর বিয়ের ব্যাপারটা না চোকা পর্যন্ত কনস্ট্যাণ্ট ওয়াচ রাখতে হবে।

অসীম সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলেন, এবারে তাহলে আমি উঠি—

এসো, কিন্তু ভুলো না যেন যা বললাম—দারিদ্র্যকে আমার বিশ্বাস নেই।

অশোকনাথ বললেন।

অসীম প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলেন।

তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মনটা যেন তার কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে।

কোথায় যেন সুরটা কেটে গিয়েছে মনের।

॥ ১০ ॥

মীরা যেন পাথর হয়ে গেল।

তার বাপের কথাগুলো যেন গরম শিসের মত প্রবেশ করে তার দু'কানকে বধির করে দিয়েছে।

উঃ, সে যেন ভাবতেও পারছে না।

তার বাপ এত জঘন্যভাবে একজনকে পর্যুদস্ত—অপমানিত—লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করতে পারে এ বুঝি মীরার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

ভাগ্যে সে ব্যাপারটা অনুমান করে ওই রাত্রেই সৌমিত্রর মেসে ছুটে গিয়েছিল।

এবং ভাগ্যে সৌমিত্র তার কথাকে শিরোধার্য করে ওই রাত্রেই একবস্ত্রে মেস ছেড়ে চলে গিয়েছে—নচেৎ বেচারীকে এতক্ষণে চরম আঘাত পেতে হতো।

আর সৌমিত্র নিশ্চয়ই ভাবত, এর জন্য একমাত্র দায়ী তার বাপই নয়—

তারও এর মধ্যে যোগাযোগ আছে।

যত ভাবে কথাটা মীরা ততই যেন দুর্নিবার একটা আক্রোশের জ্বালা তার সমস্ত দেহকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে থাকে।

দুঃসহ একটা লজ্জার গ্লানি যেন তার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে থাকে প্রচণ্ড একটা বিক্ষোভে।

কিন্তু সেও দেখে নেবে ওই সুভাষকে—

তার বাপের মনোনীত পাত্রকে কিছুতেই সে স্বীকার করে নেবে না।

সে স্পষ্টই জানিয়ে দেবে।

বলবে, ক্ষমা করো ড্যাডি, এ বিয়ে আমি করতে পারবো না—কিছুতেই না।

আজ মনে হয় মীরার—

ভগবান বোধহয় সেদিন অলক্ষ্যে বসে মিটি মিটি হেসেছিলেন।

সৌমিত্রকে সে কথা দিয়েছে।

তাকে বলে দিয়েছে, সে কোথায় গেল—সংবাদ ও ঠিকানাটা তার বান্ধবীকে চিঠি দিয়ে জানাতে।

সেই চিঠি পেলেই মীবা রওনা হয়ে পড়বে।

মীরা ঘরে এসে টেলিফোনটা তুলে নিল।

অরুণাকে কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অরুণা বাসাতেই ছিল—

সে ফোন ধরল, কে?

আমি মীরা।

মীরা, কি-রে!

শোন, একটা চিঠি আসবে তোর কাছে।

চিঠি—

হ্যাঁ।

কার—কার চিঠি ! কিসেব চিঠি ?

সৌমিত্রর চিঠি ।

তাই বল, তা হঠাৎ আমার কাছে কেন ? আমি বুঝি দূতী. তা হ্যাঁ রে, হঠাৎ আবার চিঠির কি প্রয়োজন পড়লো ?

শোন, সৌমিত্র এখানে নেই ।

নেই ! কোথায় তবে ?

জানি না, কলকাতার বাইরে ।

ব্যাপারটা কি বল তো ! কি সব হেঁয়ালি গাথাচ্ছিস—

হেঁয়ালী নয়, দেরী হবে সব বলবো আজ কলেজে ।

বাইরে কার যেন জুতোর শব্দ শোনা গেল ঐ সময়

মীরা তাড়াতাড়ি ফোনটা নামিয়ে রাখে ।

অশোকনাথ এসে ঘরে ঢোকে পরমুহূর্তে ঃ

বেবী—

ড্যাডি—

আজ কোথাও বেরিয়ো না ।

কলেজে যাবো না ?

না ।

কিন্তু ড্যাডি, আমার কলেজ—

একদিন কলেজে না গেলে কিছু এসে যাবে না ।

কথাটা বলে অশোকনাথ আর দাঁড়ায় না ।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ।

মীরা ঘরের মধ্যে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে ।

অকস্মাৎ যেন একটা নিষ্ফল আক্রোশে মনটা তার তিক্ত হয়ে ওঠে ।

যে বাপের স্নেহ এতদিন মনে হয়েছে বুঝি তুলনাহীন, এমন স্নেহ খুব কম সন্তানই পায়—সেই স্নেহটা যেন মনে হচ্ছে একটা পরিহাস ছাড়া কিছুই নয় আজ ওই মুহূর্তে ।

সেই দিনই বিকেলের দিকে এলো সুভাষ ভৌমিক।

সুভাষ ভৌমিকের নামটা কয়েকবারই তৎপূর্বে যে মীরা শোনেনি তা নয়।

কিন্তু সে যেন কেবল শোনা মাত্রই, আর কিছু নয়।

এবং এও শুনেছিল সুভাষ বাবারই এক জন বাল্যবন্ধুর ছেলে। তাদের সমপর্যায়ের না হলেও সুভাষের বাবার অবস্থা ভাল।

অভিজাত বলে সমাজে তার একটা পরিচয়ও আছে।

সুভাষকে তার বাবাই একপ্রকার ব্যবস্থা করে বিলেতে শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছে।

আর এও শুনেছিল ওই সুভাষ ভৌমিকের ওপর বাবার নজর আছে বিশেষভাবে।

[illegible] নিজের ঘরের মধ্যে শুয়েছিল মীরা।

সকাল থেকে কারো সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলেনি, খায়ওনি।

সুহাসিনী বারকয়েক চেষ্টা করেছিল কিন্তু মীরা মায়ের কথায় কর্ণপাতও করেনি।

বলেছে, বিরক্ত করো না মা।

সকাল থেকে কিছু খাসনি—

চা খেয়েছি তো।

এক কাপ চা খেলেই কি—

স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলে সুহাসিনী।

প্লিজ মা—আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

সুহাসিনী আর বেশি কথা বাড়ায়নি।

সাহস হয়নি তার।

একান্ত নির্বাক [illegible] সুহাসিনী।

সংসারে তার অস্তিত্বটা যেন বড় একটা কেউ জানবারই সুযোগ পেতো না।

স্বামী প্রচণ্ড সাহেব—এবং সর্বক্ষণ ব্যবসা ও তার নানা ধরনের স্কিম নিয়েই ব্যস্ত।

তাছাড়া তার ধন ও আভিজাত্যের অহঙ্কার যেন সর্বক্ষণ তার চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য জাল সৃষ্টি করে রাখতো।

নিজের গড়া বিচিত্র একটা জগত।

সে জগতে সুহাসিনী প্রবেশ করতে পারেনি।

একমাত্র সন্তান মীরা, সেও যেন তার বাপের প্রকৃতি নিয়েই ক্রমশ বড় হয়ে উঠছিল।

বাপের মতই আত্মকেন্দ্রিক।

কাজেই সুহাসিনীর সঙ্গে স্বামী ও সন্তানের বড় একটা সম্পর্কই যেন ছিল না।

সংসারের তিনটি প্রাণী যেন পরস্পব থেকে পরস্পব বিশেষ একটি জায়গায় একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন।

তথাপি মধ্যে মধ্যে সুহাসিনীর কণ্ঠে যে ক্ষীণ একটা প্রতিবাদের সুর জাগতো না তা নয়।

কিন্তু—

কিন্তু সেটা স্থায়ী হতে পারতো না।

অশোকনাথের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে সেটা যেন বন্যার মুখে স্রোতের কুটোর মত ভেসেই যেত বরাবর।

বেয়ারা সনাতন এসে বললে, দিদিমণি, সাহেব আপনাকে তাঁর ঘরে ডাকছেন।

মীরা মুখ তুলে তাকাল।

ড্যাডি কোথায়?

নিচে তাঁর চেম্বারে।

যাও, আমি যাচ্ছি।

সনাতন বেরিয়ে যাচ্ছিল, মীরা কি ভেবে তাকে পেছন থেকে ডাকলো।

সনাতন—

দিদিমণি—

সনাতন ফিরে দাঁড়ায়।

সাহেবের ঘরে কেউ আছে নাকি রে?

হ্যাঁ।

কে!

চিনি না। মনে হলো—

কি—

সাহেবের অফিসেরই কেউ হবে।

হুঁ—আচ্ছা তুই যা।

সনাতন চলে গেল।

আজ স্নান পর্যন্ত করেনি মীরা—শাড়িটাও সেই সকালের শাড়ি।

মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো।

উঠে দাঁড়াতেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারাটা দেখতে পেলো মীরা।

শাড়িটা কি বদলাবে—মাথাটা কি একটু আঁচড়ে নেবে চিরুনী দিয়ে?

না।

ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মীরার।

কোনো প্রয়োজন নেই।

এইভাবেই যাবে মীরা।

মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

মীরা [illegible]

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার দক্ষিণ দিকে হলঘরের সঙ্গে এ্যাটাচড অশোকনাথের চেম্বারের দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায় মীরা।

ঘরের মধ্যে একটা যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

ভরাট ভারি গলা।

একটা হাসির শব্দ।

ড্যাডি—

কে—বেবী। কাম ইন—এসো।

মীরা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

পিতাপুত্রীতে চোখাচোখি হলো, এবং মুহূর্তে যেন অশোকনাথের ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা চাপা বিরক্তির আভাস।

কিন্তু সেটা বুঝি মুহূর্তের জন্য—

অশোকনাথের মুখটা প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

ভ্রূ সরল হয়ে এলো।

বেবী, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। সুভাষ—বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিখে এসেছে বিলেত থেকে—

মীরাকে দেখিয়ে বললেন, আমার মেয়ে বেবী—

মীরা তাকাল।

সুভাষ ভৌমিক।

লম্বা চওড়া চেহারা।

পেশল বলিষ্ঠ।

টকটকে গোরাদের মত গায়ের রং।

পরনে দামি স্যুট।

মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল সুভাষ, হাউ ডু ইউ ডু?

মোটা শক্ত হাত।

মোটা মোটা আঙুল।

মীরা কিন্তু হাত বাড়ায় না, দু'হাত জড়ো করে মৃদুকণ্ঠে বলে, নমস্কার।

একটু যেন থমকে যায় সুভাষ ভৌমিক।

মুহূর্তের জন্য।

তার পরই হেসে ফেলে।

॥ ১১ ॥

কিন্তু মীরা যে ভেবেছিল ওই সুভাষ ভৌমিককে একেবারে অস্বীকারই করবে।

ফিরে তার দিকে তাকাবেও না—

সেটা কিন্তু হলো না।

সুভাষ ভৌমিকের প্রচণ্ড পৌরুষ যেন দুদিনেই মীরাকে একেবারে আচ্ছন্ন মোহগ্রস্ত বিহ্বল করে ফেলে।

ঝড়ের মতই যেন আবির্ভূত হয়ে সুভাষ ভৌমিক মীরার মনের মধ্যে একটা আকর্ষণের আলোড়ন জাগিয়ে দেয়।

প্রথম দিনের আলাপের পর—

দিন-দুই বাদে অরুণার ওখানে যাবে বলে প্রস্তুত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে মীরা, এমন সময় সুভাষ ভৌমিক এসে হাজির হলো।

ধূসর রংয়ের একটা স্যুট পরনে।

মুখে পাইপ।

মিস মিত্র—

সিঁড়ির ওপরই থমকে দাঁড়ালো মীরা।

কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি যে আপনার কাছেই এসেছিলাম—সে নিশ্চয়ই খুব জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট নয়।

না—মানে—

তবে চলুন।

কিন্তু—

মীরা ইতঃস্তত করে।

স্পষ্ট করে একেবারে 'না' বলতে কেন যেন কোথায় মনের মধ্যে একটা দ্বিধা জাগে।

ঠিক আছে, চলুন। ফেরার পথে না হয় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো। নতুন গাড়িটা আজ ডেলিভারী পেয়েছি, ভাবলাম আপনাকে সঙ্গে নিয়েই একটা ট্রায়াল দেবো।

কি ছিল কণ্ঠের ভাষায়—সুরে সুভাষের, কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারে না মীরা।

কেমন যেন মোহাচ্ছন্নভাবে এগিয়ে যায় মীরা।

নতুন আমেরিকান লাক্সারি কার।

টক টকে লাল রংয়ের।

মীরাকে নিয়ে সুভাষ গাড়িতে উঠে বসলো।

তারপরই ছোটালো গাড়ি প্রচণ্ড স্পীডে।

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট।

থর থর করে স্পীডোমিটারে নিডলটা কাঁপছে ডায়ালের খাঁচায়।

ঝড়ের গতি যেন গাড়ির চাকায়।

আকাশ পথে যেন উড্ডীন বিরাট এক পাখি।

দুর্মদ একটা বেগের কম্পন।

থর থর কম্পন।

মীরা প্রথমটায় আনমনা, তারপর যেন কেমন সব ভুলে যায়।

গতির নেশায় শিহরিত হতে থাকে।

তার রক্তে যেন আনন্দ, উত্তেজনায় এক শিহরণ—দোলা।

মীরা আজও ভেবে পায় না—সেদিন অমন করে সে কেন শিহরিত হয়েছিল, চলার নেশা কেমন করে তার সমস্ত রক্তে দোলা দিয়েছিল।

কেবল কি তাই?

সুভাষ কি সেদিন তার প্রচণ্ড হিংস্র পৌরুষ দিয়ে তার সমস্ত সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি।

সুভাষ কি তাকে বলিষ্ঠ দু'হাতে আঁকড়ে ধরেনি।

ঝড়ের মত প্রায় একঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এক জায়গায় এসে সুভাষ গাড়িটা থামালো।

কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে।

রাস্তা এখানে তেমন প্রশস্ত নয়।

দু'পাশে কেবল প্রান্তর আর গাছপালা।

ক্বচিৎ কখনো দু'একটা ঘরবাড়ি চোখে পড়ে বিচ্ছিন্নভাবে।

বেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।

আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলো পশ্চিম আকাশের গায়ে কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হয়।

সরু একটা খালের মত—

তার ওপরে একটা অপ্রশস্ত ব্রীজ।

রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোনো মানুষ চোখে পড়ে না।

আসন্ন সন্ধ্যার নির্জনতায় কেমন যেন শান্ত।

মীরার হাত ধরে নামালো সুভাষ, এসো—

শক্ত হাতের মুঠো মীরার নরম কব্জীর ওপর যেন চেপে বসে।

সুভাষের সে স্পর্শে আবার যেন শিহরিত হয়ে ওঠে মীরা।

হাতটা ছাড়িয়ে নিতেও যেন ভুলে যায়।

সুভাষ বলে, চমৎকার নির্জন জায়গাটা, না ?

মীরা কোনো জবাব দেয় না।

এক ঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে সারিবদ্ধভাবে ডানার শব্দ-তরঙ্গ তুলে উড়ে গেল।

মীরা—

সুভাষের দিকে তাকাল মীরা।

চলো, ওই পাথরটার ওপরে গিয়ে বসা যাক।

এমনিই একটা পাথর অল্প দূরে পড়ে আছে।

আশেপাশে বুনো আগাছা।

থোকা থোকা হলুদ ফুল ফুটে আছে।

বাতাসে একটা উগ্র গন্ধ।

সেই পাথরটার ওপরই দুজনে পাশাপাশি বসলো।

আলো ক্রমশ আরো ম্লান হয়ে যায়।

ঝাপসা অন্ধকার চারদিকে ক্রমে চাপ বেঁধে উঠছে।

হঠাৎ সুভাষ ডাকে, মীরা—

বলুন।

আমার এই মুহূর্তে কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো ?

মীরার দিক থেকে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা মাত্রও না করে অকস্মাৎ সুভাষ তার দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে মীরাকে বুকের ওপরে টেনে নিয়ে তার ওষ্ঠের ওপর চুম্বন করে।

মীরার সমস্ত শরীর যেন অবশ।

সমস্ত বোধশক্তি যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তারপর—

তারপরই—

সমস্ত ব্যাপারটা কোথা থেকে কি ভাবে যে ঘটে গেল—মীরার আজও যেন চিন্তার বাইরে।

সুভাষ যেন অকস্মাৎ একটা দুর্মদ ঝড়ের মত এসে তাকে কুক্ষিগত করে নিল।

কিন্তু তারপরই বিয়ের ঠিক আগেই এলো সুভাষের দিক থেকে প্রচণ্ড একটা আঘাত।

কিন্তু আঘাতটা সামলাবারও যেন সময় পেলে না মীরা।

যা হবার—যা ঘটবার তা ঘটে গেল।

দিন পনেরোর মধ্যেই সুভাষ ও মীরার বিয়ে হয়ে গেল।

অশোকনাথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, দেখলে সুহাস!

কি?

বেবীর মন থেকে কেমন করে সব মুছে দিলাম।

সুহাসিনী কোনো জবাব দেয় না।

অশোকনাথ বলে, যাক—আমার একটা বড় রকমের দুশ্চিন্তা গেল। কিন্তু সেই ভিক্ষুকটার কি আশ্চর্য সাহস জানো!

ভিক্ষুক—

বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে তাকায় সুহাসিনী স্বামীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, that begger—সেই আর্টিস্টটা—

কেন, সে আবার কি করল?

শান্তকণ্ঠেই প্রশ্নটা করে সুহাসিনী স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

কি জানি কেন একটা অজ্ঞাত ভয়ে সুহাসিনীর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

জানো না, সে একটা চিঠি লিখেছিল আমাকে—

চিঠি!

হ্যাঁ, কি অডাসিটি—একটা ভিক্ষুক—রাস্তার কুকুর, সে চায় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে! কিন্তু এজন্য তুমিই বেশি দায়ী।

আমি!

হ্যাঁ তুমি! মেয়ে কোথায় কি করছে—কার সঙ্গে মিশছে তোমারই তো দেখা উচিত ছিল। তুমি মা।

সুহাসিনী স্বামীর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলে, সেই ছেলেটি চিঠি লিখেছিল ?

হ্যাঁ।

কি লিখেছিল সে ?

সে আমাব মেয়েকে ভালবাসে—বিয়ে কবতে চায়। আমিও তার জবাব দিয়ে দিয়েছি।

কি জবাব দিলে !

লিখে দিয়েছি একটা বাস্তাব কুকুব যেন ভুলে না যায় তার সত্যিকাবেব স্থান কোথায়।

সত্যি—মিথ্যে নয়।

অশোকনাথ মিত্র ঠিক ওই কথাগুলোই লিখেছিল চিঠিতে সৌমিত্রকে।

এবং বিভূতি যে মিথ্যা বলেনি সেটা বুঝতেও দেবি হয়নি।

প্রথমবাব চিঠির জবাব মীরাব বাপ অশোকনাথ মিত্রেব ওই

আর দ্বিতীয়বার মীবাকে লেখা চিঠির জবাব তার বান্ধবী অরুণার দেওয়া জবাব।

অরুণা লিখেছিল :

সৌমিত্রবাবু,

আপনার চিঠি নিতে মীবা আসেনি, আমি দু'বার ফোন করা সত্ত্বেও আসেনি।

আমার মনে হয় মীরাকে আপনার ভুলে যাওয়াই উচিত।

ইতি—অরুণা।

সংক্ষিপ্ত ছোট্ট চিঠি।

কিন্তু সৌমিত্রর বুঝতে কষ্ট হয়নি।

অসহ্য একটা ক্রোধে সমস্ত শরীরটা ওর জ্বলে উঠেছিল এবং বিভূতি ও সর্বাণীকে কিছু না জানিয়ে সেই রাত্রেই একবস্ত্রে গিয়ে কলকাতাভিমুখী একটা মেলে চেপে বসেছিল।

কিন্তু তৃতীয় আঘাত তখনো সে জানতে পারেনি তার জন্য অপেক্ষা করছিল কলকাতায়।

উদ্‌ভ্রান্তের মত দু'দিনের ব্যবহৃত ময়লা জামাকাপড়, রুক্ষ চুল নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে মেসে নিজের ঘরে ঢুকতে যাবে—বাধা পেলো।

একজন শাদা পোশাকপরা পুলিশ-সার্জেন্ট বাধা দিল, দাঁড়ান—কে আপনি?

আমি—

হ্যাঁ, আপনিই কি সৌমিত্র সেন—আর্টিস্ট?

হ্যাঁ।

অনুগ্রহ করে একবার আমার সঙ্গে চলুন।

কোথায় বলুন তো?

তখন ইংরেজদের আমল।

পুলিশ-সার্জেন্ট বললে, লালবাজারে।

কেন বলুন তো?

তা তো আমি বলতে পারবো না মিঃ সেন, আমার ওপরে কেবল সেইরকমই অর্ডার আছে।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ।

তা আপনি জানলেন কি করে যে আমি এখানে আজ ফিরে আসবো।

পুলিশ-সার্জেন্ট মৃদু হেসে বললে, তা জানতাম বইকি, আর তাই তো আজ ক'দিন ধরে আপনার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

তা আমিই যে সৌমিত্র সেন, সেটা জানলেন কি করে?

জেনেছি বৈকি।

কি ভাবে ?

আপনার ঘরের তালা খুলে ঘরের দেওয়ালে আপনার ফটোটা পেয়েছি।

তাতেই সব জানতে পেরেছেন ?

না—বাকিটা অনুমান।

অনুমান !

হ্যাঁ। এখন দয়া করে চলুন—

বেশ, চলুন।

সৌমিত্রর আব ঘরে ঢোকা হলো না।

পুলিশ-সার্জেণ্টেব সঙ্গে গিয়ে নিচে একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে চেপে বসলো।

॥ ১২ ॥

লালবাজারে পুলিশের এক কর্তার ঘরে সার্জেণ্ট তাকে পৌঁছে দিল।

যান, ভেতরে যান মিঃ সেন, আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

সৌমিত্র দেখলো দরজার ওপরে নেম-প্লেট রয়েছে :

এ. সেন., আই-পি।

সৌমিত্র সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

বেশ বড় আকারের একটি ঘর।

একটা বড় টেবিল—টেবিলের ওপর তিন-চারটে ফোন।

টেবিলের পাশাপাশি খান-চারেক চেয়ার।

ঘরের একপাশে একটা স্টিলের আলমারি।

বেশ দীর্ঘকায় লম্বা-চওড়া একজন সেখানে।

পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম—

লোকটি একটা চেয়ারে বসে কিসের যেন একটা ফাইল মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন।

ঘরে আর দ্বিতীয় কোনো প্রাণী ছিল না।

সৌমিত্র পরে জানতে পেরেছিল ওই অফিসারটির নাম—অবনী সেন, ডি-সি স্পেশাল।

অবনী সেন মুখ তুলে তাকালেন না।

ফাইলের কাগজটা দেখতে দেখতেই বললেন, আসুন, এখানে বসুন।

সৌমিত্র এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বসল।

অবনী সেন তখনও মুখ তুললেন না।

বললেন, আপনার নাম সৌমিত্র সেন?

আজ্ঞে—

আপনি তো শুনেছি একজন নামকরা আর্টিস্ট--

জানি না, তবে ছবি এঁকে থাকি।

অবনী সেন এবারে মুখ তুলে চাইলেন। কিছুক্ষণ নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন সৌমিত্রর মুখের দিকে।

তারপর বললেন, ইউ লুক টায়ার্ড সৌমিত্রবাবু! সটান বোধহয় স্টেশন থেকে নেমে আপনার মেসের বাসাতেই এসেছিলেন।

তাই।

চা খাওয়া হয়েছে?

না।

কিছু খাবেন এখন?

প্রয়োজন হবে না। ধন্যবাদ—

অবনী সেন এবারে হেসে, [illegible], বললেন, খুব রাগ করে যেন আসছেন মনে হচ্ছে—

না—রাগ করবো কেন।

মনে তো হচ্ছে তাই।

সৌমিত্র বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

বলুন।

এভাবে হাতকড়া দিয়ে আমাকে এখানে ধরে আনালেন কেন বলুন তো?

সার্জেণ্ট স্মিথ হাতকড়া দিয়ে এনেছে নাকি?

তাছাড়া কি—ও-ভাবে নিয়ে আসাকে কি বলে!

অবনী সেন সৌমিত্রর দিকে তাকালেন শুধু।

সৌমিত্র প্রশ্ন করলে, কিন্তু কেন—বলবেন কি! আমার তো যতটা মনে পড়ছে—জ্ঞাতসারে আমি এমন কোনো অফেন্স করিনি যাতে আপনাদের পিনাল কোডের আওতায় পড়ে। তবে আমাকে আপনারা এভাবে বেঁধে নিয়ে আসতে পারেন—

অবনী সেন প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন।

সংসারে আপনার আর কে আছে?

কেউ না।

কেউ নেই—

না।

মা বাবা ভাই বোন—

কেন, আপনারা আমার সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কি সেসব খোঁজ নেননি?

সৌমিত্রর স্বরে বিরক্তির আভাস।

না, এখনো নিইনি।

তবে—

আপনিই বলুন না।

আপনার বলতে কেউ নেই আমার। ছোটবেলায়ই মা-বাবা মারা যান।

কোথায় থাকতেন ?

জিজ্ঞাসা কবেন অবনী সেন।

মামার কাছে মানুষ হচ্ছিলাম, তা তিনি—

কি—

লেখাপড়া বাদ দিয়ে আর্ট নিয়ে থাকায় মামা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই আমার নেই।

কে তিনি ?

শান্তনু গুপ্ত—হাইকোর্টের ব্যাবিস্টার, বাব-এট-ল।

তিনি কোথায় থাকেন ?

ম্যাণ্ডভিলা গার্ডেনে।

হুঁ—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অবনী সেন।

তাবপব বললেন, তা এখন তাহলে তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আপনার।

একেবারে নেই বললে মিথ্যে বলা হবে। খিড়কিব দরজা দিয়ে মামিমার সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

তার বেশি কিছু নয়—

না।

একটা কথা—

বলুন।

শুনেছি তো—আপনি নাকি ছবি এঁকে বেশ ভালই বোজগার করেন।

জানি না—তবে অভাব নেই এইটুকু বলতে পারেন।

ও—

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

প্রশ্ন করে সৌমিত্র।

করুন না—

অবনী সেন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে সৌমিত্রর দিকে আবার তাকালেন।

আমাব সম্পর্কে আপনি এত প্রশ্ন কবছেন কেন?

একটু রুক্ষকণ্ঠেই যেন কথাটা জিজ্ঞাসা কবে সৌমিত্র।

আপনি চটছেন—

ভদ্রলোকমাত্রেই এ অবস্থায় পড়লে চটে থাকে—আপনি পড়লে কি চটতেন না।

না।

মানে!

পুলিশে যাবা চাকরি কবে, তাবা চটে না।

অবনী সেন হাসতে হাসতে বলেন।

কিন্তু আমি তো আব তা নই—

তা জানি বৈকি।

কিন্তু এখনো তো বললেন না—কেন আমাকে এভাবে এখানে আপনার সার্জেণ্ট ধরে নিয়ে এসেছে।

সৌমিত্রবাবু—

বলুন।

একটা কথা বলবো আপনাকে, যদি কিছু মনে না কবেন—

বলুন। এতে আব মনে কবার কি আছে। তাছাড়া মনে করলেই বা কি হবে?

আচ্ছা রায়বাহাদুব অশোক মিত্রেব মেয়ে মীরাব সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে—তাই না!

আছে। কিন্তু সেও এখানে আছে নাকি?

না।

অবনী সেন আবার হাসলেন।

কেমন করে আলাপ হলো?

ও-কথার জবাব আমি দেবো না। কারণ সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এবারে সৌমিত্রব কণ্ঠস্বর বেশ শান্ত।

বেশ, দেবেন না।

তারপর সহজ সুরে বললেন, শুনুন সৌমিত্রবাবু, আমি আপনাকে এখুনি ছেড়ে দেবো, যদি একটা প্রমিশ আপনি আমার কাছে করতে পাবেন—

কি প্রমিশ।

দেখুন, মাবাব সঙ্গে আপনার আকাশ-পাতাল তফাত, মানে আপনাদেব সোস্যাল পজিশনের দিক থেকে—কি দরকার তার সঙ্গে আলাপ বা ঘানষ্ঠতা ব বাব ?

অর্থাৎ—কি বলতে চান আপনি !

তাকে ভুলে যাওয়াই বোধহয় সব দিক দিয়ে আপনার ভাল হবে—

আর কিছু বলবেন ?

না। অবিশ্যি আমাব কথা শোনা না-শোনা একান্তই আপনার নিজস্ব ব্যাপাব। তবু বলবো, ভুলতে পারলেই বোধহয় অনেক ভাল হয়।

আপনি কি ওই এ্যাডভাইসটুকু দেবার জন্যই আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন।

কথাগুলো বলে সৌমিত্র অবনী সেনের মুখের দিকে তাকাল।

মুখটা লাল হয়ে উঠেছে যেন সৌমিত্রর।

বুঝতে কষ্ট হয় না সে একটু যেন উত্তেজিত সত্যিই হয়েছে।

অবনী সেন কিন্তু প্রত্যুত্তরে হেসে ফেললেন।

তারপর শান্তগলায় বললেন, আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সৌমিত্রবাবু। আমি কিন্তু—

বলুন, থামলেন কেন ?

আমার যা বক্তব্য সহজভাবেই বলবার চেষ্টা করেছিলাম।

তাই বুঝি।

সৌমিত্রর কণ্ঠের ব্যঙ্গের সুরটা যেন আদৌ অবনী সেনকে বিচলিত করে না।

তিনি পূর্ববৎ মৃদু হেসে শান্তগলায় বললেন, দেখুন, মীরাকে আমি জানি—বিরাট বড়লোকের একমাত্র আদুরে সন্তান। অথচ আপনি—

আমি যে গরিব, তা মীরা জানে।

সে তো নিশ্চয়ই। তাই তো বলছি আপনাদের এ বিয়ে হলেও হবে অসবর্ণ বিয়ে।

তাও তো সে জানতো আগে থাকতেই—

না, না—আমি জাতের কথা বলিনি, বলেছি অন্য দিকটা ভেবে—

ধন্যবাদ। আর কিছু বলবার আছে আপনার?

না—কিন্তু এখন হযতো আপনার মনের অবস্থা এমন নয় যে আপনি আমার কথাটা ভাল করে উপলব্ধি করতে পারবেন—শান্তমনে পরে ভেবে দেখবেন, এ ধরনের বিয়ে কখনও সুখের হয় না—

মিঃ অবনীবাবু—

বলুন—

অবনী সৌমিত্রর মুখের দিকে তাকালেন।

একটা উপকার আমার করতে পারেন—

নিশ্চয়ই, বলুন।

অবিশ্যি আগেই আপনাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি এবং আপনার বন্ধু রায়বাহাদুরকেও জানিয়ে দিতে পারেন—তার কন্যার জন্য কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

সৌমিত্রবাবু—

হ্যাঁ—তিনি যেখানে খুশি তার বিয়ে দিতে পারেন—যে-কোনো প্রিন্স বা মালটি-মিলিয়নীয়ারের ছেলে বা তাদের সমগোত্রের সঙ্গে—সৌমিত্রর তাতে করে কিছুমাত্র এসে যাবে না।

আপনি—

তার সঙ্গে—মানে মীরা দেবীর সঙ্গে একটিবার আমার দেখা হতে পারে?

মীরার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কি হবে দেখা করে?

একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম কেবল—এ খেলা তিনি আমার সঙ্গে খেললেন কেন! বেশ—দেখা করবারও প্রয়োজন নেই—একটিবার ফোনে কনেকশনটা করে দিন।

সে তো এখানে নেই।

নেই বুঝি? না—দেখা করাতে বা ফোনে কনেকশন দিতে ভয় পাচ্ছেন।

সত্যিই সে এখানে নেই—দার্জিলিং গেছে।

বাপের ও নিজের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বোধহয়—

অবনী সেন মৃদু হাসেন।

বলেন, না—তার মায়ের সঙ্গে গেছে। সুভাষ এতদিন বৃস্টলে ছিল—কয়েকদিন হলো মাত্র ফিরেছে। ওরই সঙ্গে অশোক মিত্র অনেকদিন থেকে তার মেয়ের বিয়ে দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিল।

আশ্চর্য—

মীরা আপনাকে কথাটা বলেনি কেন, তাই তো?

অবনী সেন মৃদু হেসে বললেন।

হ্যাঁ—সে তো জানতোই—

জানতো কিনা ঠিক আমি জানি না সৌমিত্রবাবু। তবে—

থাক, থাক মিঃ সেন, ও সম্পর্কে আমি আর আলোচনা করতে চাই না। আচ্ছা, এবার আমি উঠতে পারি কি—না আমাকে হাজতে বন্ধ করবেন বলে ঠিক করেছেন।

না—না, সে কি কথা। নিশ্চয়ই যাবেন—

তাহলে—

বসুন বসুন, আমার একটা কথা ছিল।

বলুন।

আপনি ফরেনে যেতে চান—

মানে—

মানে—আপনি তো আর্টিস্ট মানুষ; ইতালি, ফ্রান্স বা ইংলণ্ড গেলে আরো কত জানতে দেখতে পাবেন। আপনার চেষ্টা আছে, প্রতিভা আছে—

সৌমিত্র মৃদু হাসলো।

তারপর শান্তগলায় বললে, ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে এটা বোধহয় মীরা দেবীর লাখপতি বাবার একটা offer—

না—না, তার এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

মিথ্যে আপনি ও আপনাব লক্ষপতি বন্ধু চিন্তিত হচ্ছেন।

না না—তা কেন, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না সৌমিত্র-বাবু—

সৌমিত্র শান্তগলায় বলে, বুঝতে পারছি বৈকি—তবে ভয় নেই। আপনার বন্ধুকে বলবেন, সৌমিত্র সেন আর ওদিকে পা বাড়াবার মত নির্বুদ্ধিতা করবে না। দয়া করে যদি এবার অনুমতি করেন তো উঠি।

বসুন—বসুন সৌমিত্রবাবু।

দেখুন—আপনার কথাটা এমন কিছু অস্পষ্ট নয় যে বুঝতে পারছি না। কিন্তু একটা কথার জবাব দেবেন কি?

বলুন।

আপনাদের মিলিয়নীয়ার অশোকনাথেরই যদি পরিকল্পনা ওটা না হয়তো—আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তির প্রতি আপনাদের এত প্রসন্ন হওয়ারই বা কারণ কি ?

দেখুন সৌমিত্রবাবু, কথাটা তাহলে আপনাকে আরো স্পষ্ট করে বলি—

আরো স্পষ্ট !

হ্যাঁ। শুনুন, দেবাশীষকে আপনি চেনেন ?

কে দেবাশীষ—দেবাশীষ মৈত্র !

হ্যাঁ—

তা চিনবো না কেন ? এককালে সে আমার স্কুল-লাইফের বন্ধু ছিল, তারপর কলকাতার একটা মেসেও পড়তে এসে এক-সঙ্গে এক ঘরে কিছুদিন আমরা ছিলাম। সে আমার পরম বন্ধু—বছর দেড়েক আগে সেই দেবাশীষ যে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল—

অবনী সেন হাসলেন।

আপনি তার কোনো সংবাদ জানেন নাকি ?

বিশেষ কিছুই না, তবে সে বেঁচে আছে—এবং পুলিশের খাতায় সে একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বলে চিহ্নিত।

বলেন কি ! সেই রোগা পটকা—গোবেচারা দেবাশীষ, যে কেবল প্রাণ খুলে হাসতে আর বাঁশি বাজাতে জানতো।

ওই তো মজা, তার সেই বাঁশি আর হাসিই তো বিপ্লবের আগুন—

বলেন কি !

হ্যাঁ, আর সরকার আপনাকেও তার সমগোত্রীয়ই মনে করে।

আমাকে ?

হ্যাঁ, তারপর অশোকনাথ সমাজের ও উপরমহলে বিশেষ একজন ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক—তারও শ্যেন দৃষ্টি যখন আপনার

উপরে পড়েছে, আপনি কেন ভারতবর্ষ ছেড়ে কিছুদিনের জন্য চলেই যান না।

সৌমিত্র কি জবাব দেবে অতঃপর বুঝতে পারে না।

চুপ করে থাকে।

সে একজন বিপ্লবী—

যেহেতু দেবাশীষের বন্ধু—সহপাঠী সে।

অবনী আবার বলেন, দেখুন সৌমিত্রবাবু, আমি সব উপর-ওয়ালাকে ধরে ব্যবস্থা করে দেবো—ইতালী, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডে চলে যান।

সরকারেব বদান্যতায়—

হ্যাঁ।

না, ধন্যবাদ!

কিন্তু—

না—বললাম তো, সরকারের ও তণ্ডুল মুষ্টিতে আমার প্রয়োজন নেই।

দেখুন, মানুষের জীবনে সুযোগ খুব কমই আসে, বিশেষ করে এমন সুযোগ।

ভাগ্যে থাকলে অমন সুযোগ আমার জীবনে আসবে অবনী-বাবু, ওতে আমার প্রয়োজন নেই।

তাহলে আর কি করবো বলুন।

আমাকে বোধহয় তাহলে ছাড়বেন না? সোজা এবারে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবেন।

না।

আবার হাসলেন অবনী সেন।

আমি তাহলে—

যেতে পারেন। তবে একটা কথা—

বলুন।

কলকাতা ছেড়ে আপনি চলে যান।

সৌমিত্র মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো।

মৃদু একটা হাসির রেখা তার ওষ্ঠ-প্রান্তে জেগে ওঠে।

শান্তগলায় বলে, বেশ তাই হবে—আজই আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো।

বলতে বলতে সৌমিত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

নমস্কার।

অবনী প্রতি-নমস্কার জানায়।

সৌমিত্র দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

অবনী সেন চুপটি করে চেয়ারটার ওপর বসে থাকেন।

॥ ১৩ ॥

লালবাজার থেকে বেরিয়ে এলো সৌমিত্র।

সে যেন অত্যন্ত ক্লান্ত।

সে কথা দিয়েছে অবনীবাবুকে—আজই সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে।

কিন্তু কোথায়?

কোথায় সে যাবে—

আশ্চর্য।

মীরা—মীরা তার সঙ্গে এমন ব্যবহারটা করলো।

কিন্তু কেন—কেন করলো।

সে তো মীরার কোনো ক্ষতি করেনি।

তবে মীরা তার এতবড় ক্ষতিটা কেন করলে।

আর করলে কিনা এমন জঘন্য—হীন উপায়ে।

স্পষ্টাস্পষ্টি সে তো তাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেই পারতো সব কথা।

মেসে ফিরে এলো সৌমিত্র।

ঘরের দরজার তালা খুলে ঘরে প্রবেশ করলো।

চারিদিকে অসংখ্য তারই হাতে আঁকা ছবি।

দেওয়ালের সর্বত্র—ইজেলের উপরে তার সেই প্রায়সমাপ্ত অয়েলপেন্টিংটা।

কেমন যেন একটা শূন্যতা—একটা রিক্ততা সৌমিত্রর সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

মীরা—

মীরা তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এমনটা করলে।

ওই জন্যই সে রাত্রে ছুটে এসেছিল কি তার ঘরে?

রায়বাহাদুর অশোক মিত্রের আদরিণী কন্যা মীরা মিত্র।

কিন্তু এ প্রহসনের কি প্রয়োজন ছিল।

সে তো যেচে যায়নি কখনো মীরার কাছে?

তার মনে কি সন্দেহ ছিল না—

সঙ্কোচ-দ্বিধা ছিল না—

ছিল।

এমন কথাও তো সে মীরাকে বলেছিল একদিন, মীরা, তুমি যে এমনি করে আমার কাছে আসো, যদি—

মীরা শুধিয়েছিল, যদি কি?

তোমার মা বাবা জানতে পারেন—

স্বাভাবিক—একদিন তো জানবেই, আর না জানলেও জানাতে তো হবেই।

তাই তো বলছি, তখন—

কি তখন।

তাঁরা যদি এটা পছন্দ না করেন?

কিন্তু আমার জীবনের সাথী নিশ্চয়ই আমি আমার পছন্দমত বেছে নেবো, আর সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

ঠিক বলছো?

মিথ্যা বলবো কেন। মিথ্যা আমি বলি না। কি হলো, চুপ করে গেলে কেন অমন করে?

কি জানি মীরা, কেন আমার মনে হয়—

কি মনে হয়?

তারা হয়তো বাধা দেবেন।

দিলে [illegible] সে বাধাকে কি ভাবে অতিক্রম করে যেতে হয়। ওসব কথা ভাববার তোমার কোন দরকার নেই সোম—

ভাববো না?

না, যা ব্যবস্থা করবার আমিই করবো। ভারটা না হয় আমার ওপরেই রইলো।

তথাস্তু দেবী।

আচ্ছা মীরা।

আর একদিনের কথা।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে দুজনে সেদিন বেড়াতে গিয়েছিল।

একটা জলাশয়ের ধারে সবুজ ঘাসের উপরে দুজনে পা ছড়িয়ে পাশাপাশি বসেছিল।

সন্ধ্যা নামে নামে—

বসন্তকাল—চারিদিকে গাছে গাছে হরেক রাজ্যের ফুলের সমারোহ।

সৌমিত্র আলগোছে মীরার একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নেয়।

ডাকে, মীরা—

বলো।

একটা কথার জবাব দেবে?

কি।

এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হলো। আর কি করেই বা এরকম হলো।

জানি না।

সহজ সুরে বললে মীরা।

জানো না!

না।

সত্যি বলছো?

মিথ্যে আমি বলি না সোমি—

এমন সময় একটা জাহাজেব ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা গেল।

কিন্তু আমি কি ভাবি জানো?

কি—

এ সৌভাগ্য আমার প্রতি বিধাতার কোন আশীর্বাদ।

সৌভাগ্য—

নয়—এ যে কুঁড়েঘরে শুয়ে রাজকন্যার স্বপ্ন দেখা।

স্বপ্ন—

হ্যাঁ—একটি নিটোল সুন্দর স্বপ্ন।

সত্যি?

হ্যাঁ। যা সুন্দর, যা দুর্লভ, যা অপ্রত্যাশিত—জীবনে সেই তো স্বপ্ন মীরা।

একটু থমকে থেমে যায় সৌমিত্র।

তারপর আবার বলে, এই দেখ না—কতদিন থেকে ছবি আঁকছি, কিন্তু ক'টা ছবি জীবনে আজ পর্যন্ত সত্যিকারের মনের মত করে আঁকতে পারলাম।

ভয় নেই গো, ভয় নেই। মীরা তোমার জীবনে কোনোদিন কোনো স্বপ্ন হবে না—

বলতে বলতে মীরা সৌমিত্রর হাতের ওপর একটা মৃদু চাপ দিয়েছিল।

সন্ধ্যা আকাশে তখন এখানে-ওখানে গোটা কয়েক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দিয়েছে!

চলো সোমি—ওঠো।

বলে মীবা।

আব একটু বসো না—

সৌমিত্রব কণ্ঠে অনুনয়েব সুব।

না, বসবো না সোমি। অনেকটা পথ বাসে করে ফিরতে হবে—রাত হয়ে যাবে।

বাসে করে কেন, একটা ট্যাক্সি যদি পেয়ে যাই—হয়তো পেয়েও যাবো।

না—না, ওঠো। আজ আবার আমার পিওনোর টিচার আসার দিন। এসে হয়তো বসে থাকবেন।

চলো—

উঠে পড়ে সৌমিত্র।

নির্জন রাস্তা।

দুজনে হাঁটতে থাকে।

একসময় সৌমিত্র বলে, কিন্তু মীরা—

কি।

তোমার কিন্তু খুব কষ্ট হবে।

কষ্ট হবে কেন?

হবে না! তুমি কত বড়লোকের মেয়ে, আর আমি—

কি তুমি ?

সামান্য একজন আর্টিস্ট—

মৃদু হাসলো মীরা।

তাছাড়া আয়ও সামান্য। যে স্বাচ্ছল্য—যে প্রাচুর্যের মধ্যে তুমি জন্মাবধি মানুষ—

সেজন্য বুঝি খুব চিন্তা হচ্ছে তোমাব ?

নিশ্চয়ই। আমাব ঘরে তোমার হয়তো কত কষ্ট হবে।

একটুও কষ্ট হবে না।

হবে—হবে, তুমি জানো না।

কেন হবে ! বড়ঘরেব মেয়ের কি গরিবের ঘরে বিয়ে হয় না ?

হবে না কেন, কিন্তু কষ্ট হয় তাদের।

কষ্টের কথা ভাবলেই কষ্ট। নচেৎ—

কোনো কষ্টই নেই।

॥ ১৪ ॥

সত্যি কথা বলতে কি—সৌমিত্রর নিজেরই কি কম দ্বিধা ছিল।

মীরা বড়লোকের আদরিণী মেয়ে—আর সে একজন সামান্য আর্টিস্ট।

হঠাৎ সৌমিত্র গলা ছেড়ে আপন মনে হেসে ওঠে।

হো হো করে হেসে ওঠে যেন কতকটা পাগলের মতই।

কি বোকার মতই না এতকাল স্বপ্ন দেখেছে সৌমিত্র।

কোথায় মীরা আর কোথায় সে।

মীরা পাঁচতলা প্রাসাদের বাসিন্দা, আর সে কিনা একতলার একটা ছোট্ট ঘরের মানুষ।

ঠিক হয়েছে।

উচিত শিক্ষা হয়েছে।

নির্বুদ্ধিতার পুরস্কার মিলেছে তার।

পাশের ঘরের সত্যানন্দ এসে ঘরে ঢোকে।

কি ব্যাপার, অমন করে হাসছেন কেন সৌমিত্রবাবু?

কে—ও, সত্যানন্দ।

কখন ফিরলেন?

এই সকালে।

তা হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে অমন করে উধাও হয়েছিলেন কোথায়?

আগ্রায়।

এদিকে পুলিশ পরের দিন সকালবেলা এসে সারা মেসটাই তোলপাড়।

তাই বুঝি।

সৌমিত্র মনে মনে হাসলো।

তবে আর বলছি কি—

তা আপনারা কি করলেন?

কি আর করবো। মেসের ম্যানেজার মহাদেববাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার?

না।

আমি যতদূর শুনেছি—তিনি বোধহয় আপনাকে আর এ মেসে রাখবেন না।

কেন বলুন তো?

পুলিশ বলছিল—

কি বলছিল?

আপনার নাকি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।... আছে নাকি মশাই?

আছেই তো।

সত্যি বলছেন ?

নিশ্চয়ই। কেন, আপনার নেই ?

আমার…না—না।

আমতা আমতা করে সত্যানন্দ।

সে কি! দেশের স্বাধীনতা আপনি চান না!

সত্যানন্দ আর কথা বাড়ায় না—

তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

সৌমিত্র হাসতে থাকে।

মিথ্যে বলেনি সত্যানন্দ।

মহাদেব চৌধুরী একটু পরেই হাজির হলেন ঘরে।

এই যে সৌমিত্রবাবু, ঘরেই আছেন দেখছি।

সৌমিত্র মহাদেববাবুকে কথা বলার কোনো অবকাশই দেয় না।

নিজেই বলে, ভয় নেই মহাদেববাবু, আজই আমি মেসের এ ঘর ছেড়ে দেবো।

সত্যি বলছেন!

মহাদেব চৌধুরী সত্যি যেন বিশ্বাস করতে পারে না—এত সহজে ব্যাপারটা মিটে যাবে।

এত সহজে এবং নিজে থেকেই সৌমিত্র মেস ছেড়ে যেতে রাজী হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, বিকেল পর্যন্ত থাকতে দিতে কোনো আপত্তি হবে না তো ?

না—না, আপনি থাকুন না। তবে কি জানেন মশাই—বোঝেন তো—ছাপোষা মানুষ।

তারপর আস্তে আস্তে বলেন, আর ওই পুলিশকে তো জানেন—ছুঁলেই আঠারো ঘা।

তা জানি বৈকি। তাহলে এবার আপনি [illegible]।

মহাদেবকে যেন একপ্রকার ঠেলতে ঠেলতে সৌমিত্র ঘর থেকে বের করে দেয়।

ওই দিনই দুপুরের কিছু পরে সৌমিত্র বেরিয়ে পড়েছিল।

জিনিসপত্র এমন কিছু নয়—একগাদা ছবি।

দুটো সুটকেশে সবকিছু ভরে বেবিয়ে পড়েছিল।

বেলা তখন প্রায় তিনটে।

সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিল ম্যাণ্ডভিলা গার্ডেনে—ব্যারিস্টার মামার বাংলোর সামনে।

সৌমিত্র জানত ওই সময় মামা বাংলোতে থাকে না—তখন থাকে কোর্টে।

একা মামিমা—মামাতো ভাই-বোনেরা কলেজে স্কুলে।

মামিমা মানসী তখন সবে দুপুরের আহার শেষ করেছে।

চাকরের মুখে সৌমিত্রর আসার সংবাদ পেয়ে মানসী তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো।

দাঁড়িয়েই ছিল সৌমিত্র।

পাশেই দুটো সুটকেশ।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল।

কি জানি কেন মানসীর চিরদিনই সৌমিত্রর ওপর কেমন যেন একটা স্নেহের প্রশ্রয় ছিল, কিন্তু স্বামীর জন্য কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না তার।

স্বামী শান্তনুর ওপর কথা বলার সাহস ওই বাড়ির কারোরই ছিল না।

তা ছাড়া মানসী চিরদিনই একটু শান্ত ও নির্বিরোধী প্রকৃতির।

এ কি রে সৌমিত্র, হঠাৎ এ সময়ে—

হ্যাঁ মামিমা, এলাম একটা বিশেষ কাজে।

তোর মামা বলছিল—

কি বলছিল মামিমা!

কি যেন করেছিস তাই পুলিশ তোকে নাকি খুঁজছে—

হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে মোলাকাতটা হয়ে গিয়েছে—

বলতে বলতে সৌমিত্র হাসে।

কি করেছিলি?

সেটা অন্যায় বলো আর বোকামিই বলো, একটা করেছিলাম মামিমা।

কি রে—

সে আর একদিন সময়মত বলবো—আজ এই স্যুটকেশ দুটো··· ভয় নেই মামিমা, এতে শুধু আমার ছবিগুলো আর কিছু জামা-কাপড় আছে। এ দুটো আপাতত তোমার কাছে রাখবে?

বেশ তো—

দিন কয়েকের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি—ফিরে এসে সবকিছু নিয়ে যাবো।

তা বেশ তো—আমার ঘরেই রেখে যা। কিন্তু তুই যাবি কোথা বল তো?

এখনো কিছু স্থির করিনি।

তবে!

দেখি—বেরিয়ে তো পড়ি এখন, তারপর দেখা যাবে। যাবারও তো কত জায়গা আছে।

হ্যাঁ রে সৌমিত্র—

স্নেহের সুরে ডাকলো মানসী।

কিছু বলছো মামি?

মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে। খেয়েছিস?

হ্যাঁ খেয়েছি।

সত্যি বলছিস?

সত্যি।…তাহলে এখন চলি মামি—

সৌমিত্র মামির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

সৌমিত্র—

কেন মামি!

আবার কবে আসবি?

তা ঠিক বলতে পারি না—তবে কলকাতায় এলে সবার আগে নিশ্চয়ই জেনো তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

কি হয়েছে রে?

হঠাৎ প্রশ্ন করে মানসী।

কিছুই হয়নি।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে—গোপন করছিস আমার কাছে।

মামি, এবার আমি যাই—

সৌমিত্র আর দাঁড়ায়নি।

বেরিয়ে এসেছিল সেখান থেকে।

তারপর দিন দশ-বারো কেমন যেন লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে।

অবশেষে হিরণ্যর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা রাস্তায়।

হিরণ্য তখন জয়পুরে থাকে।

সেখানে প্রাকটিস করছে।

হিরণ্যই তাকে জয়পুরে নিয়ে গিয়েছিল।

সেখানে একবছর ছিল—

তারপর চলে যায় ইতালী।

ইতালীতে বছর পাঁচেক কাটিয়েছে।

মাস দুই হলো ভারতবর্ষে ফিরেছে।

॥ ১৫ ॥

বাইরের বারান্দায় দামি বড় দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং করে একটা শব্দ হলো।

সচকিত হয়ে উঠলো সৌমিত্র।

রাত সাড়ে বারোটা।

উঃ, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।

অতীতের মধ্যে যেন হারিয়ে গিয়েছিল সৌমিত্র।

ভাবতে থাকে কত কথা—

মীরা এতক্ষণে তার ঘরে চলে গিয়েছে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাহলে কি করবে—

কি করবে এখন সে!

চলে যাবে—

সে রাত্রের মত আজও কি সে চলে যাবে।

কোনো প্রশ্ন নয়—

কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নয়।

মীরা চলে যেতে বলেছে—

অতএব সে চলে যাবে।

কিন্তু কেন!

মীরা বললেই তাকে চলে যেতে হবে কেন।

মীরা তার কে—

কেন তার কথায় এমনি করে পালিয়ে বেড়াতে হবে এখানে ওখানে!

কেন—

কি সম্পর্ক তার মীরার সঙ্গে !

কিসের সম্পর্ক !

মীরার স্বামী সুভাষ ভৌমিক—

সে নিশ্চয়ই আজো জানে না কিছু।

জানে না—তার স্ত্রীর অতীত জীবনের কাহিনীর কতগুলো পৃষ্ঠা আছে।

আর এখন !

সোজা গিয়ে তাকে ডাকবে নাকি—

আর সেই সঙ্গে তার সামনে মেলে ধরবে মীরার অতীত জীবনের পৃষ্ঠাগুলো !

ধরলে কেমন হয়।

কি আর হবে—

নিশ্চয়ই চমকে উঠবে ভৌমিক সাহেব।

তা উঠুক না।

বেশ মজা হবে।

বলবো, ভৌমিক সাহেব, ওই যে আপনার স্ত্রী মীরা—একদা আমার প্রণয়িনী ছিল—

ভৌমিক সাহেব বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে, সেকি !

বলবো, অনেক প্রেমের কথা—অনেক প্রেমের চিঠি, সেসব চিঠি এখনো আমার কাছে আছে।

ভৌমিক সাহেব বলবে, সত্যি !

বলবো, হ্যাঁ। সেগুলো আমি সযত্নে তুলে রেখেছি। দেখবেন নাকি ?

তখন কি চমৎকার হবে।

রীতিমত একটা ক্লাইমাক্স ভরা নাটক।

যাক না ভদ্রলোকের নিশ্চিন্ত নিদ্রার শান্তিটুকু।

জ্বলে পুড়ে খাক হোক না ভদ্রলোক।

পুড়ে ছাই হয়ে যাক না মীরার গৃহ।

কিন্তু না—

সে যাবে না।

এখানেই থাকবে।

জ্বলে পুড়ে মরুক মীরা।

আর সে ঘবে ঘরে সেই অতীত প্রণয়ের ব্যাপার নিয়ে ছবি এঁকে চলবে।

একটার পর একটা ছবি—

সেই প্রথম দর্শন থেকে শেষ বিদায়ের নাটকীয় রাতটি পর্যন্ত।

তারপর ভৌমিক সাহেবকে ডেকে দেখাবে।

কেমন লাগছে বলুন তো!

মেয়েটি কে—যেন চেনা-চেনা লাগছে—

ভৌমিক সাহেব হয়তো প্রশ্ন করবেন।

সে বলবে, কেন, চিনতে পারছেন না—

না।

ভাল করে চেয়ে দেখুন তো।

তখন ভৌমিক সাহেব আরো কাছে সরে গিয়ে দেখবেন।

বলবেন, আশ্চর্য!

কি!

ঠিক যেন আমার স্ত্রী মীরা—মীরার মত লাগছে—

সৌমিত্র হেসে উঠবে।

হো হো করে হেসে উঠবে।

মীরা চুপটি করে তার শোবার ঘরের জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাশের ঘরে তার স্বামী সুভাষ—

ঘুমাচ্ছে সুভাষ।

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত সে।

গত রাত্রে এসেছিল সে মীরার ঘরে।

আজ আর আসবে না।

মীরা নিশ্চিন্ত।

আজ আর মধ্যরাত্রে সুভাষের ঘুম ভাঙবে না।

ঘুম ভাঙবে সেই ভোর পাঁচটায়—চাকর যখন মর্নিং টি নিয়ে গিয়ে ডেকে তার ঘুম ভাঙাবে।

তথাপি আর বেশিক্ষণ সৌমিত্রর ঘরে থাকতে মীরার সাহস হয়নি।

চলে এসেছে সে।

কিন্তু সৌমিত্রকে এখান থেকে যেতেই হবে।

যেমন করেই হোক যেতে তাকে সে বাধ্য করবে।

যদি না যায়—

কিন্তু যদি সৌমিত্র না যায়।

যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত তার কথা না শোনে।

তার মিনতিতে কান না দেয়।

সেদিন সে রাত্রে সৌমিত্রর ওপরে তার যে অধিকার ছিল, যে জোর ছিল—আজ তো তার সে জোর বা অধিকার কোনোটাই আর নেই।

আজ যদি সৌমিত্র তার কথায় কান না-ই দেয়, কি করতে পারে সে।

স্বামীকেও তার সে কথাটা বলতে পারবে না।

বলতে পারবে না ওকে কোনো প্রয়োজন নেই—

ওকে যেতে বলো।

ও চলে যাক—

ওকে বলো।

বললেই সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্ত অথচ কুটিল হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে সুভাষ তাকাবে তার মুখের দিকে।

শুধু কুটিল নয়—

শুধু হিংস্রই নয়—

একটা পাশবিক আনন্দও যেন তার সে চোখের দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ে।

শিকারী যেমন থাবার মধ্যে শিকারকে চেপে ধরে নিশ্চিত অথচ একটা হিংস্র আনন্দে তাকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে ওর মুখের দিকে সুভাষও তাকিয়ে থাকবে।

আর অসহ্য সেই চাউনি।

মীরার সমস্ত শিরা উপশিরা যেন একটা অসহ্য বোবা যন্ত্রণায় টন টন করতে থাকে।

সুভাষের চোখে ওই চাউনি দেখে প্রথম দিন মীরা চমকে উঠেছিল—

সেটা বিবাহের মাত্র দু'দিন পূর্বে।

বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছে—আসন্ন উৎসবের আয়োজন চারদিকে।

মীরার মনের মধ্যেও একটা আনন্দের শিহরণ যেন থেকে থেকে ঢেউ তুলছে।

সত্যিই সৌমিত্রর কথাটা বুঝি ওই মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছিল।

সুভাষের বলিষ্ঠ প্রচণ্ড আকর্ষণ যেন তাকে মাতাল করে তুলেছিল।

তুলেছিল কি একটা নেশায়।

চারদিকে তখন তার সুভাষ।

চতুর্দিক থেকে সুভাষ তখন তাকে ঘিরে ধরেছে যেন।

হঠাৎ সন্ধ্যার পর—সেদিন।

শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল।

বিয়ের মার্কেটিং তখনো শেষ হয়নি।

মার সঙ্গে মার্কেটিংয়ে বেরিয়েছিল।

ফিরতে ফিবতে বেলা কখন গড়িয়ে গিযেছিল।

বাড়ি ফিবে স্নান করে এককাপ চা খেয়ে শরীরটাকে একটা আরাম কেদারার ওপবে এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল।

ভৃত্য এসে বললে—দিদিমণি, আপনার ফোন—

ফোন—

হ্যাঁ।

কে, জিজ্ঞাসা করেছিলি?

ভৃত্য মৃদু হাসে।

বলে, হ্যাঁ—

কে সে?

সুভাষবাবু।

ও—

মীরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

পাশের ঘরে গিয়ে ফোনটা ধরে মীরা।

হ্যালো—

কে—বেবী?

হ্যাঁ—কি খবর!

একটিবার আসতে পারো গ্র্যাণ্ডে।

গ্র্যাণ্ডে—তুমি এখন গ্র্যাণ্ডে নাকি?

হ্যাঁ—নিরিবিলিতে ক'টা দিন থাকব বলে, গ্র্যাণ্ডে একটা সুইট নিয়ে দিন দশেক আছি। এসো না—

কিন্তু—

চলে এসো। গত চারদিন তোমাকে দেখি না, মনটা কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে!

সত্যি?

হুঁ। প্লিজ, চলে এসো।

আসছি।

দেরি করো না কিন্তু—

না।

গ্র্যাণ্ডে যখন গিয়ে মীরা পৌঁছাল—শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে ঘন হয়ে এসেছে।

শহরের সর্বত্র আলো জ্বলে উঠেছে।

রিসেপশনে খোঁজ নিতেই ঘরের নম্বরটা পাওয়া গেল।

দোতলায় একটা ঘর।

লিফটে করে মীরা দোতলায় উঠে এলো।

দরজার গায়ে গিয়ে 'নক' করতেই ভেতর থেকে আহ্বান এলো—কাম ইন—

দরজা ঠেলে মীরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

তিনটে ঘর পর পর।

প্রথমেই একটা বসবার ঘর—

তারপর একটা হলঘর।

এদিক ওদিক তাকায় মীরা—

ডান হাতি শোবার ঘর—বেড রুম—তার ভেতর থেকেই আহ্বান এলো—এসো বেবী।

মীরা ভেতরে গিয়ে পা দিল—

এবং পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিকে নজর পড়ল।

মীরা দাঁড়িয়ে গেল।

গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন—পরণে পায়জামা, একটা সোফার ওপর বসে আছে সুভাষ।

মাথার চুল রুক্ষ।

সামনের ত্রি-পয়েব ওপরে কাঁচের গ্লাসে তরল পদার্থ—সোডার বোতল—হুইস্কিব বোতল।

কি হলো, এসো।

মীরা নির্বাক—বোবা যেন একেবারে।

এসো, বোস—

মৃদু হেসে আবাব আহ্বান জানালো সুভাষ।

না—

হোয়াট মন্‌সন্‌স—এসো, বোস।

না।

বেবী—

না, আমি যাই আজ—

যাবে মানে?

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সুভাষ।

এসো—এসো, কি ব্যাপার একটু ড্রিংক করছি বলে—শকড হলে নাকি?

না।

তবে?

আমি আজ যাই—

॥ ১৬ ॥

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্য মীরা ঘুরে দাঁড়ায়।

না, না—শোনো, শোনো—

সুভাষ ততক্ষণে এসে মীরার সামনের সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

একটু একটু কাঁপছে যেন সুভাষ।

সিক্ত ওষ্ঠপ্রান্তে একটা যেন চাপা বাঁকা হাসি।

আর দু'চোখের তারায়—

আলোয় চকচক করছে অস্বাভাবিকভাবে যেন চোখের তারা দুটো।

একটা লালসায় যেন সাপের মত হিল হিল করছে।

সুভাষ—

বলো।

পথ ছাড়ো। লেট মী গো—আমাকে যেতে দাও।

সুভাষের সিক্ত ওষ্ঠপ্রান্তে সেই হাসিটা যেন আবার একটু বিস্তৃত হলো।

হাতটা যেন বাড়াবার চেষ্টা করলো।

মীরার দিকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করলো সুভাষ।

এক ঝটকায় সুভাষের সেই প্রসারিত হাতটা সামনে থেকে সরিয়ে দিল মীরা।

মীরা—

সঙ্গে সঙ্গে মীরা যেন চমকে উঠেছিল।

সুভাষের দু'চোখের তারায় এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কুটিল—হিংস্র।

কেবল তাই নয়, একটা পৈশাচিক লালসায় সে চোখের দৃষ্টি যেন জ্বল জ্বল করছে।

চমকে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে মীরা পরমুহূর্তেই কিন্তু তার আগেই অতর্কিতে সুভাষের দুই রোমশ—পেশল বলিষ্ঠ বাহু মীরাকে বুকের ওপর টেনে নেয়।

নিবিড়ভাবে বুকের ওপর চেপে ধরে।

বিজাতীয় একটা স্পর্শে—আকণ্ঠ একটা ঘৃণায় মীরা যেন সেই আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করবার জন্য ছটফট করে ওঠে—

এবং দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সেই আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রবল এক ঝটকায় সুভাষকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আলুথালু বেশে ঝড়ের মতই সেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়।

কেমন করে যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল—

কেমন করে হলঘরটা পেরিয়ে, হোটেলের লবি অতিক্রম করে সোজা একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল—

কেমন করে একটা চলমান ট্যাক্সিকে থামিয়ে তাতে উঠে বাড়ির দিকে ট্যাক্সিটা চালাতে বলেছিল—

কিছুই যেন মনে নেই।

ট্যাক্সি ছাড়বার পর সীটটার ওপরে অন্ধকারে ভেঙে পড়েছিল অসহ্য কান্নায়।

আর বারবার—হ্যাঁ বারবার সেদিন এই ট্যাক্সির মধ্যে অন্ধকারে তার সমস্ত কান্নাকে ছাপিয়ে আর একটি মানুষের কথা তার মনে পড়েছিল।

সৌমিত্র—

সৌমিত্র।

কোথায় গেল—

একবার মনে হয়েছিল মীরার—ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে সে সৌমিত্রর মেসে যায়—

হয়তো আছে—

সৌমিত্র হয়তো তার মেসেই আছে।

কিন্তু পারেনি তা।

ভাবতে ভাবতেই এক সময় ট্যাক্সিটা তারপর বাড়ির গেটের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল।

এবং সেদিনই সে বুঝতে পেরেছিল সৌমিত্রর কাছে ফিরে যাবার আর তার কোনো দরজাই খোলা নেই।

সব চাইতে সহজ পথটা আজ যেন তার কাছে সব চাইতে কঠিন হয়ে গিয়েছে।

একবার সেদিন বাড়ি ফিরে প্রথম যে কথাটা মনে হয়েছিল মীরার—

সে এখনি বেরিয়ে যায়—

সেদিনকার রাত্রির মত বেরিয়ে যায়।

কিন্তু কোথায় যেন বাধা।

আসন্ন বিবাহোৎসবের জন্য বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠেছে।

লোকজন আত্মীয়-স্বজনের ভিড়।

অশোকনাথ দু'দিন আগে থাকতেই সানাই বসিয়েছেন।

সানাই বাজছে।

মীরা সোজা এসে নিজের ঘরে ঢুকলো।

ঘরের আলোটা নেভানোই ছিল।

মীরা অন্ধকারেই একটা সোফার ওপর বসে পড়লো।

সানাই বাজছে।

কিন্তু মীরার যেন বুক ফেটে কান্না আসে
ইচ্ছা হয় চিৎকার করে ওঠে—
বন্ধ কর—বন্ধ কর—এ বিয়ে বন্ধ কর।

মীরা—
কে ?
অন্ধকারেই দরজার দিকে তাকায় মীরা।
মায়ের গলা।
কোথায় গিয়েছিলি রে!
মীরা কোনো জবাব দেয় না।
প্রাণপণে চোখের উদ্‌গত অশ্রুকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে।
ঘর অন্ধকার করে রেখেছিস কেন ?
পুনরায় প্রশ্ন করেন মা।
মীরা এবারও কোনো সাড়া দিলে না।
কি রে, কথা বলছিস না কেন—
বলতে বলতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন।
মীরা মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলো।
কি হয়েছে রে—অমন করে বসে আছিস!
মা এগিয়ে এলেন।
মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন।
সস্নেহে আবার ডাকলেন, মীরা—
মীরা কোনো জবাব দেয় না।
মীরা—
কি!
মুখটা না ফিরিয়েই বললে মীরা।

কি হয়েছে ?

কি আবার হবে—

বলেই উঠে পড়ে মীরা।

এবং মাকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার কোনো অবকাশ না দিয়ে সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেক রাত্রি তখন।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মীরা একটা চাদর দিয়ে আপাদমস্তক জড়িয়ে নিজের ঘর থেকে বেরুলো।

সিঁড়ির আলোটা জ্বলছে।

একটু থমকে দাঁড়ালো মীরা—

সুইটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

একটু এদিক ওদিক তাকালো।

নিভিয়ে দিলে সিঁড়ির আলোটা—

তারপর পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সদর দিয়ে নয়—

বাড়ির পেছনের বাগানের দরজা দিয়ে সোজা গলিপথে গিয়ে পড়লো মীরা।

নির্জন গলিপথ।

হন হন করে এগিয়ে চলে বড় রাস্তার দিকে।

বড় রাস্তায় পড়েই এদিক ওদিক তাকালো।

একটা ট্যাক্সি নিতে হবে—

দেখলে খানিক দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি সেদিকে পা চালায় মীরা—

এবং দণ্ডায়মান ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

ট্যাক্সিতে উঠে সোজা এলো সৌমিত্রর মেসের সামনে—

ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করতে বলে ট্যাক্সি থেকে নেমে মেসের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলে।

দরোয়ান—দরোয়ান—

দরোয়ান দরজা খুলে দেয়।

এ কি, দিদিমণি—

আচ্ছা দরোয়ান, তোমার দাদাবাবু আছে ?

প্রশ্ন করে মীরা।

নেহি—

সহজভাবে উত্তর দেয় দরোয়ান।

মীরা যেন অত্যন্ত বিস্মিত হলো।

সত্যি নেই ?

নেহি—

কি যেন একটু ভাবলো মীরা।

বললে, কোথায় গিয়েছে ?

উ তো মুঝে মালুম নেহি হ্যায়, লেকেন দাদাবাবু তো আজ চার পাঁচ রোজ মেস ছোড়কে চলা গিয়া—

মেস ছেড়ে চলে গেছে !

আরো বিস্মিত হলো মীরা।

জী হ্যাঁ—

কোথায় গিয়েছে জানো ?

আবার প্রশ্ন করলো মীরা।

মালুম নেহি দিদিমণি—

তাহলে—

কি করবে মীরা এখন ?

কোথায় গেল সৌমিত্র—

মনটা কেমন যেন হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো—

তারপর ফিরে এলো মীরা সেই ট্যাক্সিতেই।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আবার সেই গলিপথ ধরেই মীরা বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল।

তারপর দুদিন পরে বিয়ে হয়ে গেল।

সুভাষ ভৌমিকের গৃহেই প্রথম রাত্রি।

ফুলশয্যার রাত্রি।

জেগে ছিল মীরা—

সুভাষ এসে ঘরে ঢুকল।

কত পেগ খেয়েছে কে জানে।

টলছে তখন সে—

টলমল করছে।

দাঁড়াতে পারছে না ভাল করে।

মীরা—

মীরা চেয়ে থাকে সুভাষের মুখের দিকে।

বোবা দৃষ্টিতে।

নেশায় ঢুলু ঢুলু আঁখি সৌমিত্রর।

ইউ নো, মীরা—আই হ্যাড ফিউ পেগ—তবে ভয় নেই—নেশা হয়নি—জ্ঞান ঠিক পুরোপুরি আছে—

বলতে বলতে সোজা এসে সুভাষ দু'হাতে মীরার দেহটা জাপটে ধরেছিল।

মীরা এতটুকু বাধা দেয়নি।

এতটুকু প্রতিবাদ জানায়নি।

আর সেই থেকে শুরু এই যন্ত্রণার
মর্মান্তিক এই যন্ত্রণার।
রাতের পর রাত।
দিনের পর দিন।

॥ ১৭ ॥

মা—

কে!

চমকে ফিরে তাকাল মীরা।

কখন ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে গিয়েছে—

ভোরের আলো খোলা জানলা পথে দণ্ডায়মান তার সর্বাঙ্গে এসে পড়েছে।

কিছুই জানতে পারেনি মীরা।

মীরার সর্বক্ষণের দাসী মুক্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতে তার ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা।

বয়সও হয়েছে মুক্তির।

তা বোধকরি পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে।

বেঁটে-খাঁটো গোলগাল মানুষটা।

সধবা।

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কোনোদিনই মুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

বলতে গেলে বিয়ের কয়েক রাত পরেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—

মুক্তির স্বামী জাহাজে কাজ করতো—

কদাচিত কখনো বাড়ি আসতো।

মুক্তির স্বামী দ্বিজেনকে তাই তার মামা ও মা বিয়ে দিয়েছিল, যদি বৌয়ের জন্য ঘরের প্রতি তার টান জন্মায়।

কিন্তু বিয়ের পর বৌকে নিয়ে দিনকতক ঘর করবার পর সেই যে দ্বিজেন চলে গেল—আর এলো না।

দীর্ঘ সাত বছরেও আর ফিরে এলো না।

আগে আগে তবু এক আধ বছর বাদ বাদ দ্বিজেন ঘরে আসতো মাসখানেকের ছুটিতে—

কিন্তু বিয়ের পর সেই যে গেল আর সাত বছরেও দ্বিজেন এলো না।

মামা ও মা অনেক খোঁজ-খবর নিল—কিন্তু দ্বিজেনের কোনো সন্ধানই করতে পারল না।

যে জাহাজে কাজ করত, সে জাহাজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নাকি দ্বিজেন অন্য এক জাহাজে চাকরি নিয়েছিল—

সে জাহাজ লণ্ডন, রাশিয়া, জর্মানী ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

ভারতের দিকে আদৌ আসে না।

সাতটা বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

মুক্তি আর প্রতীক্ষা করেনি অতঃপর।

সে বাপের বাড়ি চলে এসেছিল—

কিন্তু সে জানত না যে স্ত্রীর স্বামীর কাছে কোনো স্বীকৃতি নেই—

পিতৃগৃহে তার পায়ের তলার মাটিটা আদৌ শক্ত নয়।

মুক্তির দাদা শিবপদ ও তার স্ত্রী ভামিনী—যারা ছিল সংসারের কর্তা ও কর্ত্রী—

তারা স্পষ্টই জানিয়ে দিল—মুক্তি ভাইয়ের ঘরে ফিরে এসে ভুল করেছে।

মহা ভুল করেছে।

মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে চাকরি যাহোক একটা খুঁজতে শুরু করে।

এবং মুক্তিদের মত মেয়ের যা একমাত্র পন্থা—

পরের বাড়ি দাসী-বৃত্তি।

সেই দাসীব কাজই তার একটা মিলে গেল।

এবং দাসী-বৃত্তি করতে করতেই একদিন সে পেয়েছিল মীরার আশ্রয়—

বছর চারেক আগে।

সেই থেকে সে মীরার কাছেই আছে।

মা, চা এনেছি।

মুক্তির ডাকে মীরার চমক ভাঙে।

মুখ ফিবিয়ে তাকায়।

কি হয়েছে মা, মুখটা তোমার কেন অমন শুকনো শুকনো লাগছে—

চায়ের কাপটা মীরার হাতে তুলে দিতে দিতে মুক্তি কথাটা বলে।

মুক্তির কণ্ঠে উদ্বেগ।

কিছু না রে—

ঘুম হয়নি বুঝি?

না—না, ঘুম হবে না কেন—ঘুমিয়েছি তো।

চায়েব কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে মীরা।

মুক্তি বেশি কথা কখনো বলে না।

সে অতঃপর ঘর ছেড়ে চ:লে যাচ্ছিল।

মীরা ডাকে—

মুক্তি—

মুক্তি ফিরে দাঁড়ায়—

কিছু বলছিলে মা ?

সাহেব উঠেছেন ?

এই তো একটু আগে গোসলখানায় গেলেন।

ও—আচ্ছা, তুই যা।

মুক্তি চলে গেল।

শরীবটা সত্যিই বড ক্লান্ত লাগছিল মীরার।

একটা গ্লানি যেন তার সমস্ত শরীরের মধ্যে সে অনুভব করছিল।

মাথাটাও ভার-ভার লাগছে।

কপালের পাশেব শিরা ছুটো টন টন করছে, কি একটা অবসন্নতায় যেন।

চা-টা কেমন যেন বিস্বাদ লাগে মীরার মুখে।

কিছুটা খেযে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে মীরা।

সৌমিত্র—

সমস্ত মনটা জুড়ে সৌমিত্র।

সৌমিত্রকে যেন মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না মীরা।

কেন—

কেন এলো সৌমিত্র।

তার আসবার কি দরকার ছিল ?

কেন এলো সে মীরার কাছে।

চিন্তায় ছেদ পড়লো।

মীরা—

পাশের ঘর থেকে সুভাযের গলা শোনা যায়।

সুভাষ ডাকতে থাকে।

মীরা—

মীরা পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

ইতিমধ্যে সুভাষের স্নান হয়ে গিয়েছে।

অফিসে যাবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে।

আরশির দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গলার টাইটায় নট লাগাচ্ছিল সুভাষ।

সামনের আরশির গায়ে মীরার ছায়াটা পড়লো।

আমি একটু আসানসোল যাবো আজ—

গলার টাইতে নট লাগাতে লাগাতে বলে সুভাষ।

তবে মীরার দিকে তাকায় না।

ফিরেও দাঁড়ায় না।

নটটা লাগাতে লাগাতেই আরশির দিকে তাকালো সুভাষ।

দেখতে পেলে মীরাকে সেই আরশিতে।

আরশির মসৃণ গায়ে প্রতিফলিত হয়েছে মীরার মুখ।

হ্যাঁ, মীরার মুখই তো—

প্রতিফলিত মুখটা স্পষ্ট দেখতে পায়।

কিন্তু ও কি!

মীরার মুখ ও রকম কেন?

মনে হচ্ছে মীরার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা চিন্তার মেঘ এসে ঘিরে রয়েছে।

মনে হচ্ছে মীরা যেন কিছু চিন্তা করছে।

গভীর চিন্তা।

তাহলে—

ঠিক ধরেছে।

ঠিকই মনে ভেবে নিয়েছে।

তার অনুমানটা তাহলে মিথ্যা নয়।

সৌমিত্র—

ওই সৌমিত্রই মীরার মনে রং ধরিয়েছিল সেদিন।

হ্যাঁ—

অবশেষে সূত্রটা খুঁজে পেয়েছিল সুভাষ।

খুঁজে পেয়েছিল মনের হারানো সূত্রকে।

গত রাত্রেই খুঁজে পেয়েছিল।

বুঝতে পেরেছিল সে কেন সৌমিত্র সেনকে অফিসে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয়েছিল ওই মুখখানা চেনা।

মনে হয়েছিল চেনা—

অথচ মনে করতে পারছে না।

মনে করতে পারছে না কবে কোথায় ঠিক ওই মুখখানা সে দেখেছিল।

আর সেই থেকে সুভাষের মনের মধ্যে একটা গাঢ় কুয়াশা আজ পর্যন্ত জমেছিল।

এবার মনের কুয়াশাটা কেটে গেল।

পরিষ্কার।

মনের কুযাশাটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা নিষ্ঠুর আনন্দে মনটা যেন সুভাষের উল্লাসত হয়ে উঠেছিল।

ঠিক হয়েছে!

চমৎকার হয়েছে!

পরিকল্পনাটা তাব সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

সৌমিত্র সেনকে বাড়িতে নিযে আসাটা সত্যিই বেশ চমৎকার হয়েছে।

এবার—

এবার সুযোগ দিতে হবে।

রাশ আলগা দিতে হবে।

তবে তো খেলা জমবে।

খেলা ভালই জমবে।

মীরা আজো ভুলতে পারেনি সৌমিত্র সেনকে—

নিশ্চয় পারেনি।

আর তাই সুভাষ আজো মীরাকে পায়নি।

মীরা তার জীবনে অলভ্যাই থেকে গিয়েছে।

মীরা তার জীবনের সব চাইতে বড় ও সব চাইতে মর্মান্তিক এক পরাজয়।

এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সুভাষ।

পায়নি।

কিন্তু এতদিনে সুযোগ পেয়েছে সুভাষ।

কাল রাত্রেও লনে বসে বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে সুভাষ ওই কথাগুলোই ভাবছিল।

মীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুভাষের কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি।

সুভাষ আবার বলে, শুনেছো—

শুনলাম।

শান্তকণ্ঠে মীরা জবাব দেয়।

আজ ফিরতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না—

তবু মীরা জবাব দেয় না।

কেন ফিরতে পারবে না বা কবে ফিরবে—

কোনো প্রশ্নই নয়।

গলার টাইতে নটটা শক্ত করতে করতে সুভাষ পূর্ববৎ মীরার দিকে না তাকিয়েই বলে, ওই ভদ্রলোকের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো কিন্তু—

মীরার মুখে এবারও কোনো কথা নেই।

পূর্ব কথার জের টেনে সুভাষ বলে, হ্যাঁ—ভদ্রলোকের যেন কোনো কষ্ট না হয়—

• মীরা নির্বাক।

সুভাষ ফিরে তাকাল স্ত্রীর মুখের দিকে।

বললে, সব কিছু চাকর-বাকরের ওপর ফেলে দিও না—নিজে একটু .দখাশোনা করো—

সুভাষের হঠাৎ নজরে পড়লো মীরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

একটা নিষ্ঠুর আনন্দে সুভাষেব বুকটা উথলে উঠতে থাকে।

মনে হচ্ছে যেন নিষ্ঠুর আনন্দে সুভাষ মীরাকে পায়ের ত৽ায় পিষছে।

এক পক্ষে কি বলা ভালই হলো—

সুভাষ আবাব বলে।

মীবা পূর্ববৎ নিশ্চুপ।

বাড়িতে তো সর্বক্ষণ বলতে গেলে একাই থাকো, ওই আর্টিস্ট ভদ্রলোক তোমাকে কিছুটা কোম্পানি দিতে পাববে—

দেখ, আ।ম বলছিলাম কি—

স্ত্রীব মু:খর দিকে তাকাল সুভাষ।

জিজ্ঞেস কবলে, কি ?

তুমি তো গাড়িতেই আসানসোল যাচ্ছো—

হুঁ।

আমিও তোমার সঙ্গে যাই না—

আমার সঙ্গে!

তাই বলছিলাম।

পাগল--

মৃদু হেসে সুভাষ বললে।

কেন ?

নয়। আমি বিজনেসের ব্যাপারে এদিক ওদিক ঘুরবো, তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে।

একটু থামে সুভাষ।

আবার বলে, তাছাড়া আমার ইচ্ছা—

কি—

ভদ্রলোক কি করছেন না করছেন—কি তার প্রয়োজন, সেটা তো তোমাকে দেখাশোনা করতে হবে—

আমাকে!

না দেখলে আর কে দেখবে—

সুভাষ কথাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন থামিয়ে দিল।

মীরা আর দাঁড়াল না—

তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে।

সুভাষের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হাসির বিদ্যুৎ যেন।

॥ ১৮ ॥

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

মীরা ঘর থেকে বেরোয়নি—

সৌমিত্রর কোনো খোঁজ-খবরও নেয়নি।

আর সৌমিত্র—

কখন রাত শেষ হয়ে গিয়েছে—

শিবু এসে চায়ের কাপ রেখে গিয়েছে জানতেও পারেনি।

নজরও দেয়নি।

চেয়ারটার ওপর যেমন বসেছিল তেমনি বসে আছে।

শিবু আবার এক সময় ঘরে এসে ঢোকে।

বাবু—

উঁ—

আপনার ব্রেক ফাস্ট দোবো ?

না—থাক।

স্নানের জন্য কি গরম জল দোবো ?

না।

ঠাণ্ডা জলেই স্নান করবেন।

হ্যাঁ।

বাইরে একটা শব্দ শোনা গেল।

জুতোর মচ মচ শব্দ।

শিবু সরে দাঁড়াল।

সৌমিত্র মুখ তুলে তাকাল।

সুভাষ ভৌমিক—

গুড মর্নিং মিঃ সেন।

গুড মর্নিং—

সৌমিত্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

আহা, বসুন বসুন—

সুভাষ হাসিমুখে বললে।

আপনি—

সৌমিত্র সসঙ্কোচে বলে।

আপনার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো ?

না—না—

হ্যাঁ, নিজের বাড়ি মনে করবেন। আমি একটু আসানসোল যাচ্ছি—

সৌমিত্র শুধু তাকিয়ে রইলো।

আজ আর ফিরবো না, তবে মিসেস ভৌমিক রইলেন—কোনো প্রয়োজন হলে তাকে বলবেন। আচ্ছা চলি—

সুভাষ ভৌমিক আবার জুতোর মচ মচ শব্দ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌমিত্র আবার বসে পড়লো চেয়ারটার ওপর।

সারা দুপুরটাই বলতে গেলে সৌমিত্র চেয়ারটার ওপর বসে বসেই কাটিয়ে দিলে।

হয়তো তার চলে যাওয়াই উচিত।

যে জন্য সে এসেছিল এখানে, সে আশাও তার পূরণ হয়েছে।

মীরার সঙ্গে তার দেখাও হয়ে গিয়েছে।

তবে—

সে কি হেরে গেল?

হেরে গেল মীরার কাছে?

কেন হারবে।

কিসের জন্য হারবে।

না—

হারবে না—

হারবে না সৌমিত্র।

হারা তার হবে না।

মনের মধ্যে কেমন যেন চঞ্চলতা।

কেমন যেন অস্থিরতা—

সৌমিত্র উঠে দাঁড়ালো।

স্নান করেনি—

প্লেটে কার আহার্য ঘরের মধ্যে টেবিলে শিবু সাজিয়ে রেখে গিয়েছে।

সৌমিত্র তা লক্ষ্য করেনি—

স্পর্শও করেনি।

হঠাৎ এক সময় সন্ধ্যার দিকে উঠে দাঁড়ালো সৌমিত্র।

শিবু—শিবু—

শিবু বোধকরি ঘরের দরজার আশেপাশেই কোথাও বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

ভেতর থেকে ডাক শুনে সেও সাড়া দিলে।

আজ্ঞে—

বলেই দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে এলো।

আমাকে ডাকছেন বাবু?

শিবু—

আজ্ঞে—

আমি এবার এই ঘরে কাজ করবো, কেউ যেন এদিকে না আসে, বুঝেছো?

আজ্ঞে। কিন্তু বাবু—

কিছু বলবে?

আজ্ঞে সেই কাল রাত থেকে কিছুই তো খেলেন না, এক কাপ চা পর্যন্ত খেলেন না এখন পর্যন্ত—

সৌমিত্র কেবল মৃদু হাসে প্রত্যুত্তরে।

তারপর শান্তকণ্ঠে বলে, তুমি যাও।

বাবু—

হ্যাঁ, তুমি এখন যাও।

শিবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌমিত্র অতঃপর এগিয়ে গেল।

দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

দিয়ে ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে দিল।

ফিরে এসে স্যুটকেশটা খুললো।

আঁকবার নানা সরঞ্জাম ভরা স্যুটকেশটা।

একটা পেন্সিল নিয়ে সৌমিত্র ঘরের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালো।

শাদা ধবধবে দেওয়াল।

চমৎকার লাইম পালিশ করা।

সৌমিত্র হাতের পেন্সিলটা দিয়ে সেই শাদা ধবধবে দেওয়ালের গায়ে আঁকতে শুরু করলো।

রেখায় রেখায় নানা ছবি সেই শাদা দেওয়ালের গায়ে ফুটে উঠতে থাকে।

ছবি—

ছবি—

ছবির পর ছবি।

আর তার গায়ে গায়ে রং।

নানা রং।

রংয়ের রামধনু যেন আলো ঝলমল আকাশের গায়ে ফুটে উঠছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উৎরে যায়।

রাত এগুতে থাকে।

সৌমিত্র তবুও আঁকতে থাকে দেওয়ালের গায়ে।

পেন্সিল আর রং দিয়ে।

রাত আরো বাড়তে থাকে—

সৌমিত্রর কিন্তু বিরাম নেই।

বিশ্রাম নেই।

এঁকেই চলেছে—

শুধু এঁকেই চলেছে।

ছবি আর ছবি—

ছবির পর ছবি।

রংয়ের পর রং।

। ১৯ ।

মধ্যরাত্রে—

দরজায় মৃদু ধাক্কা শোনা গেল।

প্রথমটায় শুনতে পায়নি সৌমিত্র।

আবার মৃদু ধাক্কা বন্ধ দরজায়।

আবার।

এবারে শুনতে পেলো সৌমিত্র।

কে?

সৌমিত্র—

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল।

দরজাটা খুলে দিল সৌমিত্র।

এসো—

মীরা এসে ঘরে ঢুকলো।

আমি জানতাম তুমি আসবে—

সৌমিত্র বলে।

তুমি এখনো যাওনি কেন?

না—যাইনি।

সৌমিত্র—

বলো মীরা দেবী।

যাবে না তুমি?

যাবো—যাবো বৈকি, চিরদিন তোমার এখানে আমি থাকবো নাকি?

কিন্তু কখন—

কাজ শেষ হলেই চলে যাবো।

ঠিক ওই সময় দেওয়ালের দিকে তাকালো মীরা।

আর তার নজরে পড়লো দেওয়ালে আঁকা নানা রংয়ের ছবি-গুলোর ওপর।

ও কি!

ও কার ছবি!

সঙ্গে সঙ্গে মীরাব দৃষ্টি স্থিব হয়ে গেল।

নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে সেদিকে—

সেই দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলোর দিকে।

ও কি—ও কি এঁকেছো!

কাঁপা গলায় প্রশ্ন কবে মীরা।

চিনতে পারছো ওদের? ওই ছবির ছেলেমেযে দুটিকে?

মীরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে এবার সৌমিত্র।

সৌমিত্র—না, না—

ছুটে যায় মীরা ছবিগুলো মোছবার জন্যই বুঝি।

বাধা দেয় সৌমিত্র।

মুছবে না ও ছবি মীরা দেবী।

না, না—মুছে ফেল—মুছে ফেল ও ছবি—

ব্যস্ত হয়ে বলে মীরা।

ও ছবি সহজে মুছতে তো পারবে না মীরা দেবী।

সৌমিত্র—

ঠিকই বলছি মীরা দেবী।

না—না, ও ছবি মুছে দিতেই হবে।

মৃদু হাসলো সৌমিত্র।

হ্যাঁ—দেওয়াল থেকে মুছে ফেললেও, আমার মন থেকে তো আর মুছে ফেলতে পারবে না।

মীরা এবার দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয়—

পারবো—পারবো—ও ছবি আমি মুছে ফেলবো।

মীরা দেবী—

না, না—ও ছবি তোমাকে মুছে ফেলতেই হবে।

না মীরা দেবী, ও ছবি মোছবার চেষ্টা করেছো কি ভৌমিক সাহেবকে আমি—

সৌমিত্র—

হ্যাঁ—সব বলে দেবো তাকে।

বলে দেবে!

গ্রীবা বেঁকিয়ে দাঁড়ায় মীরা।

হ্যাঁ—বলে দেবো।

গম্ভীর হয়ে যায় মীরা।

বলে, বলতে পারো—তোমার একটা কথাও কিন্তু বিশ্বাস করবে না ভৌমিক সাহেব।

করবে না—এখনো প্রমাণ আছে।

প্রমাণ!

সেই চিঠিগুলো—

কিসের চিঠি!

যেসব প্রেমের চিঠি একদা রাত জেগে জেগে বিনিয়ে বিনিয়ে আমার কাছে লিখেছিলে—

সৌমিত্র—

সেসব চিঠিগুলো আজো আমার কাছে আছে।

নীচ—ইতর—

তাই বটে মীরা দেবী—তুমি মহারানী সাধু হলে আর আজ আমি চোর—

থেমে যায় সৌমিত্র—চোখ তুলে তাকায় মীরার দিকে।

তারপর বলে, কিন্তু রায়বাহাদুরের মেয়ে—একটা কথা তোমার

আজ আমি জিজ্ঞাসা করি—সেই সেদিন তবে সে নাটকটা করেছিলে কেন?

নাটক!

নয়?

সে কি!

শুধু কি তাই—তারপর বাপ-মেয়েতে মিলে আমায় বেইজ্জতি করতেও কম চেষ্টা করোনি!

বিশ্বাস করো সৌমিত্র—

কি বিশ্বাস করবো মীরা দেবী? সামান্য একটা বানানো মিথ্যে গল্প—কিন্তু এখনো তোমায় অকপটে বিশ্বাস করবো আমি—ভাবলে কি করে!

সেদিনকার সব কথা তুমি নিশ্চয়ই কিছু জানো না। যদি সেসব জানতে—

আরো কিছু জানবার সেদিন ছিল বুঝি?

মীরার কাছ থেকে এ কথার উত্তরের অপেক্ষা আর বুঝি দরকার মনে হলো না সৌমিত্রর।

বললে, কিন্তু থাকেও যদি—সে জানবার আজ আর আমার এতটুকু আগ্রহও নেই—সময়ও নেই আমার।

তুমি আমার কোনো কথা শুনবে না সৌমিত্র?

মীরার চোখদুটো ছল ছল করে ওঠে।

জল ভরে আসে।

টলটল করে জল।

না—শোনবার প্রয়োজনও নেই—

সৌমিত্র বলে।

বেশ, না শুনতে চাও না শুনবে, কিন্তু তুমি দেওয়ালের ওই ছবিগুলো মুছে দাও।

সত্যকে এত ভয় মীরা দেবী!

সৌমিত্র—

ভয় কেন ?

দয়া করো সৌমিত্র—

ওইটি তো আজ পারবো না মীরা দেবী! তাছাড়া দয়া করবার আমরা কে—আমাদের দয়া করবে তো তোমরা—

কথাগুলো বলে সৌমিত্র সুটকেশটা খুললে।

তার ভেতরে নিজের তুলি আর রং সব একে একে গুছিয়ে রাখতে শুরু করে।

সৌমিত্র—

বলো।

তুমি চলে যাচ্ছো ?

হ্যাঁ।

সত্যিই চলে যাচ্ছো ?

চলে যেতে বলেছো চলে যাচ্ছি।

কিন্তু—

কি!

ওই ছবিগুলো—

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সৌমিত্র।

ওগুলো মুছে দিতে হবে।

সৌমিত্র মৃদু হাসলো।

মুছতে পারি—তবে এক সর্তে—

কি বলো। যত কঠিনই হোক—

পারবে ?

আজ—সব—সব আমি—

তুমি মেনে নেবে ?

হ্যাঁ।

দেখো—শুনে পিছিয়ে যাবে না তো ?

না।

শেষবার আবার সে রাত্রের মতো—

না—বলো।

আমার সঙ্গে—

কি—

তোমাকে যেতে হবে।

যেতে হবে!

একটা আর্ত চিৎকার যেন বেরিয়ে এলো মীরার কণ্ঠ চিরে।

হ্যাঁ—আমার সঙ্গে।

কোথায়?

যেখানে নিয়ে যাবো।

আমি—

থেমে যায় মীরা।

কি, থেমে গেলে যে!

মীরা যেন বোবা হয়ে গেছে।

হেসে ফেলে সৌমিত্র।

তারপর আবার বলে, জানি—সেদিনও যেমন পারোনি, আজো তেমনি পারবে না তুমি। তবে কোনো ভয় নেই—তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।

সৌমিত্র—

যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

হ্যাঁ মীরা দেবী—

শান্তকণ্ঠে বলে সৌমিত্র, সত্যিই ঠাট্টা।

সৌমিত্র—

তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছো মীরা দেবী বুঝতে পারছি। কিন্তু ভয় নেই—আমার মত এক তুচ্ছ ব্যক্তির তোমার সুখের শান্তির সংসারে এতটুকুও কাঁটার আঁচড় কাটবার সামর্থ্য কোথায়?

একটু থেমে বলে, আর তা আমি নিশ্চয়ই করবোও না।

মীরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

নির্বাক।

যেন সৌমিত্র তাকে হঠাৎ নির্বাক করে দিয়েছে।

তার কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে।

সৌমিত্র এগিয়ে গেল।

সুটকেশটা খুললো।

অতঃপর সুটকেশের ভেতর থেকে সোনালি ফিতে দিয়ে সযত্নে বাঁধা এক গোছা চিঠি বের করলো।

তারপর সেগুলো মীরার সামনে এগিয়ে ধরলো।

নাও—তোমার চিঠিগুলো—

মীরা নির্বাক।

নির্বাক।

নির্বাক।

যেন পাথর—

মীরা যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

সামনের টেবিলটার ওপর সৌমিত্র সোনালি ফিতেয় বাঁধা চিঠির বাণ্ডিলটা রেখে দিল।

বললে, এতদিন ওগুলো গুছিয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানো।

কেন?

যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো—তোমাকে সেদিন ওগুলো ফিরিয়ে দেবো বলে।

কেন?

কেন! কারণ আমি যদি বলতামও ওগুলো নষ্ট করে ফেলেছি, তুমি বিশ্বাস করতে পারতে না।

সৌমিত্র—

যাক, আজ আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হলাম—তোমার আর আমার পরিচয়ের শেষ ও একমাত্র প্রমাণ তোমার হাতে তুলে দিতে পারলাম।

একটু থেমে যায় সৌমিত্র।

তারপর বলে, আর দেওয়ালের ওই ছবিগুলো—

বলতে বলতে স্যুটকেশ থেকে বের করলো একটা তুলি।

কিছুটা রং—

কালো রং।

বললে, এই কালো রং ও তুলিটা এখানে আমি রেখে গেলাম, তুমিই ওই দেওয়ালের সব ছবিগুলো মুছে দিও—কিংবা বার-দুই হোয়াইট ওয়াশ করলেও মুছে যাবে।

সৌমিত্র কথাগুলো বলে স্যুটকেশটা বন্ধ করে সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিলো।

মীরা এতক্ষণ শুধু চেয়ে আছে।

সৌমিত্র বললে, চলি—

কোনো কথা বলে না মীরা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সৌমিত্র নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গেট দিয়ে বেরুতে যাবে সৌমিত্র—

হঠাৎ একটা গাড়ির হেডলাইট ওর চোখে মুখে এসে পড়লো।

বেশ জোরালো আলো।

ওকে যেন মুহূর্তে অন্ধ করে দেয়।

সৌমিত্র আর এগুতে পারে না—

আপনা হতেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

একটা গাড়ি সৌমিত্রর পাশে এসে তৎক্ষণে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

একি মিঃ সেন—

কে!

আমি সুভাষ—কিন্তু এত রাত্রে—কি ব্যাপার—হাতে আবার সুটকেশ—

আমি চলে যাচ্ছি মিঃ ভৌমিক।

চলে যাচ্ছেন!

হ্যাঁ—নমস্কার।

হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ায় সুভাষ ভৌমিক।

স্থির ধারণা ছিল সুভাষ ভৌমিকের—ওদের সুযোগটুকু দিলে ওরা তা গ্রহণ করবেই।

তাই আসানসোলের নাম করে—রাত্রে ফিরে আসবে না বলে বেরিয়ে পড়েছিল।

এবং সময় মত—

ঠিক সময় মত ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে মধ্যরাত্রে ফিরে এসেছে সুভাষ।

কিন্তু একি হলো।

এই মধ্যরাত্রে সৌমিত্র চলে যাচ্ছে!

কেন?

কি হয়েছে—

কিছুই বুঝতে পারে না সুভাষ।

নমস্কার—

কথাটা বলে সৌমিত্র এগিয়ে চলে।

কয়েক পা যায়ও।

শুনছেন—

পেছন থেকে ডাকে সুভাষ।

মিঃ সেন—শুনুন—

ফিরে দাঁড়ালো সৌমিত্র।

আমাকে ক্ষমা করবেন মিঃ ভৌমিক। যে কাজের ভার নিয়ে এসেছিলাম, সেটা করতে পারলাম না—চলে যাচ্ছি।

শান্তকণ্ঠে কথাগুলো, বলে সৌমিত্র।

তাইতো জিজ্ঞাসা করছি—চলে যাচ্ছেন কেন?

ওই তো বললাম।

মীরা—মানে আমার স্ত্রী মীরা জানে যে আপনি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছেন!

হ্যাঁ—জানে সে—

জানে!

হ্যাঁ—তাকেই তো বলে এলাম।

মীরা—মানে—

আপনার স্ত্রী আমার পূর্ব পরিচিত মিঃ ভৌমিক।

পরিচিত—

হ্যাঁ—শোনেন নি তার কাছে!

না তো—

হয়তো আপনি বলবেন—এখানে এসে মীরাকে দেখে তাকে চিনতে পেরেও সে-কথাটা আপনাকে বলিনি কেন।

মিঃ সেন—

হ্যাঁ মিঃ ভৌমিক—অস্বীকার করবো না। আমার মনে পাপ ছিল।

পাপ—

তাই মনের মধ্যে একটা কুটিল হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। প্রথম সে হিংসার সত্যিকারের চেহারাটা আমার চোখে পড়েনি—যখন পড়লো লজ্জায় যেন আমার মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। তাই—

একটু থেমে যায় সৌমিত্র—

তাঁরপর বললে, ভাই আমি চলে যাচ্ছি। আচ্ছা—নমস্কার মিঃ ভৌমিক।

সৌমিত্র আর দাঁড়াল না।

এগিয়ে গেল।

সুভাষ—সুভাষও যেন কেন আর তাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারে না।

দাঁড়িয়ে থাকে।

সেইদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

পেছন থেকে ডাকতেও পারে না সুভাষ।

চলে যাচ্ছে।

সৌমিত্র চলে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে পা ফেলে সামনের দিকে।

কিন্তু আর দেখা গেল না।

অন্ধকারে সৌমিত্রর আবছা মূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

সুভাষ তবুও দাঁড়িয়ে থাকে—

এবং অনেকক্ষণ ওই ভাবে তাকিয়ে থাকে।

তারপর এক সময় শিথিল ক্লান্ত পায়ে কোনোরকমে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার।

কেবল মাত্র একটা ঘরে আলো জ্বলছিল।

ঘরের দরজাটাও খোলা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সুভাষ।

খোলা দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

মীরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

পাথরের মত—

সে যেন সম্বিৎ হারা।

কোনো দিকে খেয়াল নেই।

সামনের দেওয়ালে কতকগুলো ছবি আঁকা—

নানা রংয়ের ছবি।

মীরা তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

একদৃষ্টে—

নির্নিমেষ চোখে।

সুভাষের পায়ের শব্দে সে ফিরেও তাকাল না।

কিছুক্ষণ এ ভাবে কাটে।

মীরার দিকে তাকিয়ে থাকে সুভাষ—

দেওয়ালের আঁকা ছবিগুলোর দিকেও।

মীরা যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায়।

সামনের দিকে নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে।

তাড়াতাড়ি তুলিটা তুলে নেয়।

সৌমিত্রর রেখে যাওয়া সেই তুলিটা।

তারপর কালো রংয়ে তুলিটা বুলিয়ে নেয়।

অতঃপর সেই তুলিটা নিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে দেওয়ালটার ওপরে।

আর সেই ছবিগুলোর ওপর দিয়ে তুলিটা টানতে থাকে।

সুন্দর ছবিগুলোর গায়ে দাগ পড়ে।

মোটা দীর্ঘ কালো দাগ।

মীরা আবার কালো রংয়ে বুলিয়ে নেয় তুলিটা।

আবার বুলোতে থাকে দেওয়ালের গায়ে।

মীরা—

ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে সুভাষ।

এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই মীরার।

যেন শুনতে পায় না—

সুভাষের ডাক যেন তার কানে যায় না।

মীরা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে।

আবার তুলি লাগায় দেওয়ালে।

আবার।

আবার।

তুলির মোটা দাগ পড়ে সুন্দর ছবিগুলো কালো রেখায় রেখায় ভরে গেছে।

ছুটে আসে সুভাষ।

মীরার হাতটা চেপে ধরে।

মীরা—মীরা—একি করছো—

ছাড়ো—ছাড়ো তুমি আমায়—

না—না—

মীরাকে দু'হাতে বুকের ওপর টেনে নেয় সুভাষ।

মীরা—মীরা—

মীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে এতক্ষণে।

প্রকাশিত হয়েছে—

বিমল মিত্র

[illegible]টুনী	...	৫-০০
[illegible]মোহর	...	৩-০০
তোমরা দু'জন মিলে	...	২-৫০
মনে রইলো	...	২-৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানস-প্রতিমা	...	৪-০০
আজ শুভদিন	...	৩-০০
সারা জীবনেব সাথী	...	২-৫০
[illegible]জযোটক	...	২-০০
[illegible]প্রিয়া	...	২-০০
কি রূপ হেরিনু	...	২-০০
সুচরিতাসু	...	২-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]লোকাভিসার	...	২-৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জড়ানো মালা	...	৩-০০
হৃদি ডোরে বাঁধা	.	২-৫০
যখন বাতাসে নেশা	...	২-০০
হাতে হাত রাখি	...	২-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible]নেত্রা	...	২-০০

বুদ্ধদেব বসু

দুই ঢেউ, এক নদী [illegible]		

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মধুছন্দা	...	৪-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চাঁদমুখ	...	২-৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

তবু মনে রেখো	...	৩-৫০
দু'জনে নির্জনে	.	৩-০০
একবৃন্তে-দুটিফুল	...	২-০০
ঘরের আলো	...	২-০০
অয়ি সীমন্তিনী	...	২-০০

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রিয়সঙ্গিনী	...	২-০০

নবেন্দু ঘোষ

ভালোবাসা	...	২-৫০

শরৎচন্দ্র পাল

জন্ম-এয়োস্ত্রী	...	২-০০

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

লক্ষ্মী এলো ঘরে	...	৩-০০
ফুলশয্যার রাতে	...	২-০০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চকন্যা	...	২-৫০

আশাপূর্ণা দেবী

জনম্-জনমকে সাথী	...	৪-০০
[illegible]	...	২-৫০